

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রোৎপলা

চিত্রোৎপলা

কানাই সামন্ত

শ্রাবণ
১৩৫৩

সাহিত্যিকা
১২৩ আম্‌হারস্ট্‌ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫৩
শিল্পগুরু শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রসজ্জিত

প্রকাশক শ্রীমানিক চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্যিকা, ১২৩ আমহার্স্ট্ স্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

মূল্য আড়াই টাকা

চিত্রোৎপলা উড়িষ্যায় কোণার্কমন্দিরের পূর্ববাহিনী প্রবাহিনীর নাম।

সূর্যদেবের অলৌকিক প্রসাদে উৎপলবন উল্লসিত হ'ত কি তার লাস্যগতিশীল তরঙ্গে তরঙ্গে ? অথবা অজস্রভাসমান নির্মাল্য বহন ক'রে সার্থক ছিল তার নাম ? অথবা নিখিল রূপের উৎপলতুল্য প্রতিবিম্বরাজিতে ছিল সে চিত্ররূপিণী ?

কী জানি ! মন্দিরে আজ নেই দেবতা। সুবর্ণবালুরাশিতে যাত্রা শেষ করেছে সাগরাভিসারিণী সূর্যউপাসিকা। নামটি তবু ছবি এঁকে দিচ্ছে মনের নয়নে, জীবনের জাগাচ্ছে উপমা, ধরছে কাব্যের রূপ। মন ভুলোচ্ছে।

স্নেহময়ী মাতৃদেবীর
শ্রীচরণে

দিদি

আমাদের সকলের দিদি—
বিধবা, শুচি, সুন্দরী ;
বাইশ-তেইশ বছরের খেয়া
ঋতুর ঋতুর উপহার এনেছে জীবনের ঘাটে—
বসন্তে শুভ্র ভুঁইচাঁপা ;
নিদাঘে শুভ্র করবী ;
বর্ষায় বৃষ্টিবিধৌত রজনীগন্ধার গুচ্ছ ;
শরতে আকাশে-উড়ে-যেতে-চাওয়া কাশস্তবক,
পান-পাতাড়ির ফুল, সাদা কল্কে ;
হেমন্তে শুভ্র চন্দ্রমল্লিকা ;
শীতের রাতে শিশিরসম্পৃক্ত কুন্দ
দলে দলে যার কান্নার শোভা হাসিতে বিধৃত ।
একাহারে তপঃক্লিশা গৌরীর মতো তাঁর তনু ;
শান্ত দুটি চোখ,
দৃষ্টি তার দিনের আকাশে চাঁদের যেন কোণা
হাসিতে যার মায়া আছে মাদকতা নেই ॥

ছোটো হই বড়ো হই আমরা তাঁর দাদা।
আমাদের থাকা না-থাকা এত অনিশ্চিত,
সংখ্যাও এত বেশি,
বড়ো মেজো সেজো ন কোনো বিশেষণে বিশেষ যায় না চেনা।
তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাই আমরা ইংরেজের রাজশাসনকে—
কেবল ভাইয়ে ভাইয়ে ভালোবাসার জোরে,
সহাস্য 'না' বলার ক্ষমতায়,
সত্যের প্রতি চরম আগ্রহে,
শত্রুর প্রতিও পরম আস্থায়
অন্তরের অন্তরে সে মানুষ ব'লে।
ফলে, দারোগা ও পুলিশের গাল খাই হাসিমুখে,
মাথা ফাটে যখন-তখন।
ভীরুর বাড়ে সাহস ;
ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায় সমব্রতী বন্ধু ;
জোরের সঙ্গে বলে— না ;
নিষ্কপর্দক সেবকদের ক্লেশবরণ দেখে
নিজেদেরও শেষ কড়ি খুইয়ে
সকল ক্লেশের জন্য হয় তৈয়ার।
ফলতঃ পল্লীতে পল্লীতে জাগে সাড়া ;
আর, আমরাও চলে যাই কারার আড়ালে,
বলা নেই কহা নেই,
সময় বা অসময় নেই,

সহসা যে-কোনোদিন।
দিদি হয়তো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবে একবার,
"নতুন দাদাকেও নে গেল মুখপোড়ারা।"
পল্লীগ্রামের মেয়ে;
ব্যাকরণশুদ্ধ হয় না ভাষা,
শালীনতাও থাকে না সব সময়।
বলে রাখি তবু, 'মুখপোড়া' গাল শুনে
জাহানাবাদ থানার গফুর-মিঞাও হত খুশী;
চটতো, বাপু, দশানন বললে॥

দিদি আমাদের তরে
দুধ জ্বাল দেয়, দই পাতে,
মুড়ি ভাজে, ভাত রাঁধে।
দুবেলা পরিপাটি ক'রে আসন পেতে
[দু-একখানা থাকে গুন্‌চটের খোলে]
নিকোনো দাওয়ায় ভাত বেড়ে দেয় পরম যত্নে;
কাঁচা আমের কচি আমড়ার অম্বল সাজিয়ে দেয়
হালের-আমদানি এলুমিনামের বাটিতে;
চৌকাট-গোড়ায় ব'সে জিগুসে,
"আর কী লেবে, দাদা?"
সব দাদাই মুখ তোলেন;
সম্বোধন হল কারে কে জানে!
বয়সে যদি হই ছোটো, ব্যবহারও হয় সহজ হাসিখুশির,

খাওয়ানোর বেলায় যত গল্প দিদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখসুখের ;
আঁচিয়ে সুপুরি হাতে নিয়েও শুনতে হয় কিছুক্ষণ, এক পা বাড়িয়ে

কত দাদা এসেছ্যালো, কত চলে গেছে ;
দিন যায়, নিত্য নূতন দাদাদের নিয়েই বিব্রত—
সকলকে রয় না মনে।
কেবল ভোলা যায় না শান্তিকে—
সৎব্রাহ্মণের ছেলে, শ্যামবর্ণ ;
কথা জানে, কথা কয় না বেশি ;
মুচকে মুচকে হাসে,
মিষ্টি ক'রে কখনো
দিদির কথার করে অনুকরণ দিদির সুরে ;
আবদার করে ছল ক'রে।
বয়স কতই হবে— ষোলো-সতেরো ;
ছোটোবেলায় কাঁদিয়ে গেছে যে ভাইটি
সে যদি থাকত আজ অত বড়োটি হত ;
অমনি হাসিমুখে তুচ্ছ আবদার করত দিদিটির কাছে।
শান্তিও থাকে না, ফিরে ফিরে জেলে যায় ;
কে জানে, বাপু, আছে এখন
কোন্ দমাদম্-ইস্পিশালে
কোন্ হিজ্লীতে।
শ্রাবণ ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন পড়তে সে এস্বে
হৈমবতী মায়ের আগমনের আগে

ভোরের পানে যখন ঘাটে যেতে শিউলিতলায়
ফুল বিছিয়ে থাকবে রাশি রাশি ॥

পালি ছাগলের ছানা-ক'টিরে
স্নেহ করেই কাটে দিদির দিন
[আর আমাদের কাজে] —
বেলাশেষে ডেকে ডেকে আনে তাদের
এপাড়া ওপাড়া থেকে ;
বুকে করে খায় চুমো কচিমুখে ;
[আদরকারিণীর কপালের উপর থেকে
আলগা তুগাছি চুল হাওয়ায় ওড়ে,
চিবোতে চায় তাই অবোধ]
নিঃসন্তানের স্নেহ উথলে ওঠে, বোবা জন্তুর
কালো চোখের আলোয় মা-ডাক শুনে ।
বুঝতে পারে না ভালো,
আবার ভোলে—
গুন্-গুন্ স্বরে যে সঙ্গীত বেজে উঠতে চায়
বোবা বুকের ভিতর ॥

ভোরে গোয়াল কুড়োয় ;
সকালে গাই দোয় বাছুর বেঁধে ছাতিমতলায় ;
মা ব'লে হাত বুলিয়ে দেয় পাটলা গাইয়ের চিকণ দেহে ;
ভাই ব'লে শাসন করে তুরন্ত বাছুরটিরে ॥

সে একদিন
খাওয়া-দাওয়ার পর বিকালে
এক-উঠোন রোদ রয়েছে তখনো,
বেলা রয়েছে পড়ে—
বর্ষাবাদলের জন্যে জ্বালানির সঞ্চয় চাই :
দিদি বসল তেঁতুলের ডালপালা নিয়ে দা হাতে।
এমন সময় পশ্চিমে উঠল কালো মেঘ,
আকাশের আধখানা দিল ঢেকে ;
তালের বাকলে ঝলক দিতে দিতে
কখন মিলিয়ে এল আলো ;
ঠাণ্ডা হাওয়া বইল ;
সজল শ্যাম মাঠের এদিকে ওদিকে
বক উড়ে পড়ল বাসার সন্ধানে।
কাজ ফেলে দুয়োর ধ'রে
দিদি কী দেখলে ক্ষণকাল।
তারপরে ছুটল মাঠ-পানে আল-পথে—
বীজ-ধানের ক্ষেত ডাইনে বাঁয়ে ;
পাকা সড়কের ওপারে নাবাল ভূমিতে
বেনা ও বাব্‌লার বনে বানের জল এসেছে দিন দুই হল,
দূর হতে দেখা যায়, আঁকাবাঁকা জলরেখা
শ্যামা পৃথিবীর বুকে ঝিক্‌ঝিক্‌ করে যেন সাতনরী হারগাছি॥

চি ত্রো ৎ প লা

আষাঢ়ের শুরু হতেই
মাঝে-মাঝে বৃষ্টি নামে, থামতে জানে না ;
দিনরাত যায় ভেসে খামখেয়ালি দেব্‌তার খুশিতে
অশান্ত বৃষ্টির ছাটে।
ভোরের দিকে আকাশের একটু ধরন হয় ;
কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার এসে নামে বাদলা।
দূরের বন পার হয়ে, মাঠ পার হয়ে,
বাঁশবাগানে শন্‌-শন্‌ শব্দ জাগিয়ে,
নতুন টিনের চালে তড়্‌বড়িয়ে দড়্‌বড়িয়ে,
বড়ো বড়ো ফোঁটা ফেলে খড়ের পালুইয়ে
কলুমে আমের পাতায় পাতায়
সারা উঠোনে ॥

গৃহস্থালির কাজের মাঝখানে
আর হয় না কাজ করা।
দিদির মনে পড়ে— এই যে এত-সব ভাই
এরা থাকবে না কেউ দু দিন বাদে,
ডাকতে আসবে না 'দিদি' ব'লে ;
আজ হোক কাল হোক, থেমে যাবে লড়াই,
উঠে যাবে শিবির,
সংসার চলবে যেমন চলেছিল ;
তখন একলা ঘরে পড়ে থাকবে নিঃসঙ্গিনী দিদি,
নিঃসন্তান, বিধবা।

আহা, নিজের ভাইটি যদি থাকত
সে কি ফেলে যেতে পারত কোনো দিন ?
মনে পড়ে সেই আধভোলা মুখ, আধভোলা হাসি ;
ঘরে গিয়ে দিদি দুয়োর বন্ধ করে কাঁদে ॥

কুইনাইন সেবন আবশ্যক ; জল চাইতে গিয়ে
শুনতে পাই গুন্‌-গুন্‌ গানের মতো কী স্বর—
বেদনার গীতা ।
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, নিঃশব্দে ফিরে আসি ।

বালিগঞ্জ
২৪ আষাঢ় ১৩৪০

যোগীন

অষ্টপ্রহরব্যাপী বিশ্রী এই বাদলায়
জানিনে কী দশা যোগীনের।
কুঁড়েঘরখানাতে
কয়েক আঁটি খড় গোঁজা দেবার
শ্লথ বিলম্বিত আয়োজন
যদিবা সমাধা হয়ে থাকে,
ছিটে-বেড়ার দেয়াল
আটকাবে কি এই ঝড়ের দাপট
কী জানি দু-তিন হাজার মাইল দূরে
কোন্ দূর সমুদ্রে
সমুদ্রউপকূলে
ঘূর্ণতাণ্ডবে জাহাজ ডুবিয়ে
জনপদ বিধ্বস্ত ক'রে
এতদূরে এসেও যার উন্মাদ দাপাদাপি
থামতে জানে না—
শালের বনে, মহুলের বনে,
আমে, জামে, বাঁশবাগানে,
ঝাউয়ের শাখাপ্রশাখায়
দীর্ঘশ্বসিত হাহাকার জাগায় একটানা।

চি ত্রো ৎ প লা

ছ-ফুট-দীর্ঘ দেহখানা নিয়ে
বেশ হেঁট না হলে যে ঘরে ঢোকাই তার দায়
তারই একটা কোণে
অবশিষ্ট খড়ের গাদায় বা
কাঠের চৌকির একধারে
কাপড়ের খুঁট অথবা
ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে যোগীন
দিনটা কাটাচ্ছে কী ভাবে
কী জানি ॥

শিথিলবন্ধন সঙ্গিনওঁচানো
পুরোনো একটা কঞ্চির মোড়া ছেড়ে দিলে
মানুষের উপবেশনযোগ্য পীঠ হল ঐ চৌকিটা
ঐটেই টেনে টেনে
চা-সংযুক্ত উচ্চ আলোচনার
পীঠস্থান বানিয়েছি আমরা
যোগীনের আবাসস্থলকে।
ঐটেই রাত দশটায়
কুঁড়েঘরের ভিতর ফের টেনে নিয়ে
ছ-ফুট দেহটাকে ওর
চার ফুটের অনুপাতে সংকুচিত ক'রে
যোগীনের ঘটে অনুদ্‌বিগ্ন রাত্রিযাপনা।

অভগ্নত্বের গৌরবে ও যে
চতুষ্পদসমাজে আজও অচল নয়,
এবং ওর ফাটলে-সঞ্চরমান ছার্‌পোকাকুল
কামড়াতেও জানে না
[অন্তত যোগীন তাই বলে—
না বাবু, চেনা মনিষ্যিকে কামড়ায় না]
এই সান্ত্বনাই কি যথেষ্ট ?
অন্যের বেলা যাই হোক,
যতদূর জানি,
যোগীনের বেলায় বিজ্ঞ সহানুভূতিভরে
দীর্ঘছন্দে ঘাড় নাড়বার কারণ আমাদের নেই।
এমনিই যোগীনের স্বভাবসিদ্ধ ঔদাস্য
বা আলস্য
বা উভয়ের মিলিত মিশ্রিত একটা রসায়ন—
দেহে, মনে ॥

ভালো লাগে লোকটাকে ঐ কারণেই তো।
বাদশাহী ঐ মন্থরতা !
বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে দেব কি বাদশাহী কথাটা ?
হতে পারে, সুসভ্য শান্তিনিকেতনে
চালচুলোর অসদ্ভাবটাই ওর
চোখে পড়ে আগে ;
তা পড়ুক, তবু

বড়োঘরানা দিল্ ওর,
ভিতরের ঐশ্বর্য সেটা—
ক্রমশ মনে ধ'রে যায়
আমাদের মতো দু-পাঁচজন সমজদারের।
উত্তরে তিন-পাহাড়িয়ার কোলে
ভালো জমি আছে ওর বিশ-বাইশ বিঘে ;
গোলাভরা ধান,
গোয়ালভরা গরু ;
স্ত্রী মারা গেছে ষোলো-সতেরো বছর হল,
আছে কিন্তু ভাইভাজ, জ্ঞাতিকুটুম্ব,
মানসম্ভ্রম আশপাশের পাঁচ-দশখানা গাঁয়ে—
আর একটি ছেলে,
নেহাৎ শিশু ॥

অবশ্য, খুঁটিনাটি কথা কোনোই
আদায় হয়নি যোগীনের মুখ থেকে।
বিশ-বাইশ বিঘে জমির কথাটাই শোনা আছে।
আর শুনেছি, গেল বছর আশ্বিনে,
পুজোর ষষ্ঠীর দিন সকালবেলা
আগমনীর সানাই বাঁশি
হয়তো বাজছে ডাঙার ওপারে কোন্ গাঁয়ে,
এখানে রাস্তার রাঙা ধুলোয়

চি ত্রো ং প লা

শিরীষের-ডালপাল-ছাঁকা রাঙা রোদটি
মধুর আর করুণ লাগছে
মোহিত দৃষ্টিপাতে—
মনে হচ্ছে বুঝি ও নিঃশব্দ ভৈরবী—
একহাঁটু ধুলো নিয়ে এমন সময়
একটি লোক এসে দাঁড়ালো
একেবারে ওর ঘরের সামনে।
রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই রইল।
[বলা হয়নি এপর্যন্ত,
চায়ের দোকান যোগীনের,
অথচ চা সে বিক্রি করে না
পথ-চলতি যাকে-তাকে—
অনুগৃহীত বাঁধা খদ্দের তার
আমরাই
গুটি-চার চিত্রকর, কবি এবং বাউণ্ডুলে]
লোকটাকে দেখে দেখে ব'লে উঠল যোগীন,
"কে গো ?— তুমি আবার কে ?—
দাঁড়িয়ে রইলে যে ?"
আস্তে আস্তে এগিয়ে এল সে,
একেবারে অবাক্ করে দিয়ে
পায়ের ধুলো নিল যোগীনের,
বললে তারপর,
"আমায় চিনতে পারলে না, বাবা ?

আমি তোমার পাঁচু।”
গাঁয়ের মানুষ, অল্প বয়স তায়,
বলতে-বলতেই কেঁদে ফেললে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে।
পাঁচু!
এতদিন পরে চিনতে পারবার কথাই বটে!
এ মুখে আর কবেকার চেনা সেই
কচি একখানি মুখে মিল কৈ!
ওরই মায়ের
চোখের চাউনি আর চিবুকের আদল
একটুখানি উঁকিঝুঁকি দিয়ে
লুকোলো কেন!
পুরোনোকে বিদায় দিয়ে
মনের কোণটুকু নতুনকে ছেড়ে দিতে
যোগীনেরও চোখ ছল্‌ছলিয়ে ওঠে

তারপর
কুঁড়েঘরের ভিতরে ব'সে
বাপ-বেটায় কী কথা হল কে জানে!
বাড়ি ফেরার কথায় যোগীন বললে,
তিন টাকা আর বুঝি সাড়ে-সাত আনা
বাকি প'ড়ে আছে খদ্দেরের কাছে;
দেনাও আছে কিছু;
সে সবের কিনারা না ক'রে

হুট্ বলতেই যাওয়া তো যায় না—
হাঁ, যাবে বৈ কি !
যাবে সে শিগ্‌গির্‌ই !
ইত্যাদি ॥

যাহোক, চলে গেল ছেলে।
কী বুঝল ছেলে, কী বুঝল যোগীন,
তারাই জানে, তবে
আমাদের নিত্যকার মজলিশ আজও ভাঙেনি—
চা-পরিবেশনে সাকীর দায়িত্বটা
যোগীনই লঘুভাবে বইছে ॥

ভালো লাগে শ্লথ লঘু চালটা।
গুলি খাক না-খাক, গুলিখোরের মতো চেহারা ;
যেমন দীর্ঘ তেমন হৃষ্টপুষ্ট নয় ;
যখন হাঁটে, মাটি মাড়িয়ে চলে যেন
রীতির খাতিরে—
নইলে হাওয়ায়
পা ফেলে যেতেও মানা নেই ॥

সকল সময় দেখিনে।
এসে দেখি,
হাঁ-হাঁ করছে ঘরখানা।

তার মধ্যে নেই কোনো আমন্ত্রণ।
আমরা ব'লেই জানি, আমন্ত্রণ আছে চারধারে—
ঝর্‌ঝর্ করছে গাছের পাতা,
ঝল্‌মল্ করছে আলোছায়া,
কলরব করছে পাখ-পাখালি,
কাছে এসেই ছুট দিচ্ছে গাছের গুঁড়িতে
চটুল কাঠবেড়ালি।
তাছাড়া রাস্তায় ক্যাঁকোঁ শব্দে যাচ্ছে গরুর গাড়ি,
কালো-পাথরে-কোঁদা
চলেছে সাঁওতাল মেয়ে আর পুরুষ।
ছুটির দিন।
সুতরাং, চৌকি মোড়া খুঁজে-পেতে
নিজেরাই বসি নিরুদ্দিষ্ট দোকানীকে
কয়েকটা হাঁক দিয়ে।
দেখাশোনার বহু বিষয় আছে—
আলোচনার—
লি-পো'র কবিতা থেকে আরম্ভ ক'রে
আইন্‌স্টাইনের দেশকাল-জোড়া থিয়োরি অবধি
[কোনোটা বুঝি,
কোনোটা বুঝিনে] —
ইতিমধ্যে
ঘণ্টাখানেক না পেরোতেই
হয়তো হাজির হয় যোগীন।

হয়ত্যো অন্তর্ধান করে ফের দুধ-চিনির সন্ধানে।
আধ-ঘণ্টা তিন-কোয়ার্টারের ভিতরেই অতঃপর
পরিবেশন করে কয়েক পেয়ালা চা।
দৈবে যদি ভালোও না হয়
বলবার জো নেই মুখ ফুটে।
অভিমান করে কেবল
ঐ একটা বিষয়ে।
নইলে উদাসীন॥

কেন যে দেশছাড়া
বোঝা যায় না।
বলে,
থাকতে হয় সেখানে পরাধীন।
স্নেহের অধীন? সমাজের অধীন?
বলে,
চা'ও মেলে না অজ্ সেই পাড়াগাঁয়ে।
সুতরাং এই প্রবাসই ভালো।
এই প্রবাসেই আছে যুগ যুগ হ'ল।
সন্ধ্যাবেলায় আর কেউ ছিল না যখন
একদিন কেবল বলতে শুনেছি ওকে,
"ভারি ভালোবাসত, বাবু, আমার ছোটোমামা!
প্রায় সমবয়সী।

সে থাকলে আজ জোর ক'রেই নিয়ে যেত ;
কোনো কথাই শুনত না আমার।"

হায় রে মানুষের মন !
যে গেছে সে তো আসবে না আর
জোর খাটাতে।
তার কথা মনে করা কেন ?
এমন মন-কেমন-করা
বাদলার দিনেও
মিছে মনে করা কেন ?

শান্তিনিকেতন
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

সুতনু

জন্ম তার সুমাত্রার উপলবিচিত্র উপকূলে,
ভারতমহাসিন্ধুর সুনীল তরঙ্গশীর্ষে বিকশিত শুভ্র ফেনপঙ্‌ক্তি
প্রতিনিয়ত লুটিয়ে পড়ে যেখানে বালুকায়,
শীকরস্নিগ্ধ দক্ষিণবায়ুর ঝটিকা এসে
নারিকেল-বনের মাথায় মাথায়
আলোছায়ায় অপরূপ চঞ্চলতা জাগায়॥

এসেছিল শাল-তাল-মহুয়ার দেশে,
রাঙামাটির পথ যেখানে
ঢেউ-খেলানো ডাঙায় উঠে নেমে
চলেছে সেই দূরের হাতছানিতে
শ্রাবণবেলায় যার পাহাড়ে মেঘে মিশে
দিগন্তে একখানি নীলাভ স্বপ্ন রচনা করে,
ফাল্গুনে ফুল্ল পলাশ-শিমুলের দীপালিতে
আমাদেরও প্রাণে এসে লাগে অরুণ মায়া॥

এসেছিল রূপভাবুক কিশোর বন্ধু সেই
গুরুর শিক্ষায় আর নিজের অক্লান্ত সাধনায়
রূপরচনার বাঞ্ছিত বর পাবে ব'লে—
নয়নপ্রদীপে যেন আরতি জ্বালা,
চোখ পড়ে যখন যেখানে

মুগ্ধ দৃষ্টি বলে, মরি! মরি!
সেই তার পূজা ॥

শুষ্কমুখে অনাহারে
মাঠে বনে ঘুরে বেড়াতো উদয়াস্তকাল—
বিস্মিত হ'ত প্রজাপতির ভাঙা ডানা কুড়িয়ে পেয়ে;
থমকে দাঁড়াতো যৌবনযোগিনী আকন্দের মৃদুগন্ধে।
ক্ষুধার জন্যে থলিতে কিছু রুটি।
পিপাসার জন্যে?—
খোয়াইডাঙার বালুকায় তো বইছে
ঝির্‌ঝির্ বারিধারা—
বঙ্কিম, শীর্ণ, মনোহর;
নয়তো রয়েছে কোপাই,
নিজের কূলে কূলে গ্রামগুলির ভগ্নী,
বনগুলির বান্ধবী,
ক্ষেতগুলির স্তন্যদায়িনী মাতা ॥

দ্বীপপ্রতিগত বন্ধুর: মনে পড়ে আজ কত কথা,
যখন দেখেছি তাকে একা ব'সে
বক্ষসোহাগিনী বেহালার কূজনে গুঞ্জনে মগ্ন;
অবিন্যস্ত সোনালি চুল ঝাঁপিয়ে পড়েছে নতমুখে;
দ্বার-জানালার ফাঁকে ফাঁকে বিকালের আলো এসে

সোনার কাঠি ছুঁইয়েছে এখানে সেখানে—
তৈজসপত্রে, ধুলায়।
অথবা মালতিসুরভি শুক্লসন্ধ্যায়
নাচের ছন্দে যে মুহূর্তে করেছে পদপাত
অঙ্গে অঙ্গে এসেছে সুদূর স্বদেশের
ঝর্নার নৃত্য, সমুদ্রের হিন্দোল,
নারিকেল-বনের অধীর কাঁপন—
ভ্রম হয়েছে, সেই যেন সঙ্গীত একখানি ;
দেহবীণার সব তারগুলি
অদৃশ্য কোন্ গুণীর করস্পর্শে ঝঙ্কৃত, উতলা ॥

মন ভুলে যায় শীতাতপ-ক্ষুৎপিপাসার খেদ ;
শরীর তা সয় না।
ভাদ্রের দ্বিপ্রহরে ঘুরে
নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল একদিন—
ভীতমনে বরফ চাপাচ্ছি যখন মাথায়
সে শুধু বলেছিল, কী সুন্দর রক্তিমা ! কী সুন্দর !

অন্য একদিন গুরু বললেন বনফুলের ছবি বানাতে ;
সন্ধানে তার কতজন গেল কত দিকে।
তুলট কাগজের উপর অনুরাগক্ষরিত তুলিকাপাতে
সুতনু এঁকে আনল একটি লতা।

চিত্রোৎপলা

অবাক হয়ে শুধালেন গুরু, কই ফুল !
সে বলেছিল, আলোকোৎসুক ঐ লতা
আকাশ খুঁজছে ; ওরই ডগায়
অরুণ ছুটি পাতার আড়ালে ফুল আছে,
দেখা যায় না ।
অনুভব করা যায় শুধু ॥

সে চলে গেছে ;
আজ মনে পড়ছে তার অসীম বিশ্বাস, সরল নির্ভর
শঙ্কা কী জীবনে ?—
সূর্য হাসে আমার পানে চেয়ে,
রাত্রে তারাগুলি জেগে থাকে
আমার সুপ্তির শিয়রে ॥

শান্তিনিকেতন
২৫ আশ্বিন ১৩৪২

সুতনুর উদ্দেশে

কবি তুমি ; বিহঙ্গ তুমি ;
তুমি নও আমাদের মতো।
সাথি তুমি মলয়সমীরণের ;
বসন্তশরতের অতিথি তুমি মহাসমুদ্রের পারে পারে ;
কোনো তরুর শাখায়
তোমার নেই কোনো চিরন্তন নীড়॥

এসেছিলে সেই কথাই মনে পড়ে
বৎসরের আবর্তনে যখন
সেই ঋতু ফিরে আসে সেই বনে—
আবীর-ছোঁয়ানো লাজাঞ্জলি ছড়ানো শিউলিতলায় ;
আলোছায়ায় আল্পনা আঁকা সবুজের স্তরে স্তরে ;
সোনাঝুরির ফুলের বাহারে ঢেকে যায় পাতার বাহার ;
মুক্তামালা ঝল্‌মল্‌ করে পথের পাশে ;
কত পাখির কণ্ঠে ওঠে কত হুলুধ্বনি।...
সবুজে-সোনায়-আঁকা পাখা মেলে
উড়ে গেছ যে বন্ধু আমার
ফিরবে না, জানি :
উর্ধ্বগ শাখায় উদ্দেশে ধরা থাকুক্‌ কুসুমঅর্ঘ্য॥

শান্তিনিকেতন
২৯ আশ্বিন ১৩৪২

বর্ষাসন্ধ্যা

মেঘমুক্ত দিনশেষে
উঠোনে একা বসে আছি মোড়া পেতে।
ভিজে মাটির বাস উঠছে,
আর ভেকের ঐকতান।
আকাশে তারা দেখা দিল।
বাদুড় উড়ে চলেছে নিঃশব্দ পাখায়
কালো রাত্রির ইঙ্গিত বহন ক'রে॥

এই মুহূর্তে অর্ধেক পৃথিবী ব্যেপে
দিবসের মুগ্ধ মন্থর ধারার মিলনাশায়
উচ্ছলিত হয়ে উঠল রাত্রির জোয়ার—
নির্জন মোহানার ধারে ধারে
একা চলেছেন তাপসী সন্ধ্যা
শান্তিসলিলে ঘট ভ'রে নিয়ে॥

এই মুহূর্তে অর্ধেক পৃথিবীতে
মানুষের উন্মত্ত কর্মোন্মাদনা
শীতল হয়ে আসছে কোন্ মায়ামন্ত্রে।
গৃহলক্ষ্মীর হাতে
এ গৃহে শুধু বেজে উঠল না শাঁখ,
বেজে উঠল আরও শত লক্ষ গ্রামে

কত লক্ষ গৃহে।
কত গিরিসানুতে কত নদীতীরে—
নৌবতে বাজল বাঁশি,
মন্দিরে বাজল আরতির ঘণ্টা,
আজান দিল মসজিদে গভীর গম্ভীর স্বরে।
বৎস-সঙ্গে গাভী ফিরে এল গোষ্ঠগৃহে,
শিশু ফিরে এল জননীর ক্রোড়ে,
পাখি ফিরে এল সুপ্তিসুনিবিড় নীড়-পানে।
মহাশূন্যে যেমন অগণ্য তারা
দীপ্ত হল অগণ্য প্রদীপ লোকালয়ে লোকালয়ে।
কল্পনার চেয়ে আশ্চর্য বড়ো
সুনিশ্চিত বাস্তব।
কল্পনা কি আলিঙ্গনে পাবে
সেই সীমাহীন সম্পূর্ণকে ?
এই মুহূর্তে কত বনে কত প্রান্তরে—
বর্ষণ হচ্ছে অশ্রান্ত ধারায়,
বিদ্যুৎ খেলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে,
অস্তমিতসূর্য কত দিগন্তে
ছিন্নমেঘে এখনও মোছেনি আরক্ত আভা
কান্নার মতো করুণ,
অথবা নির্মল নীলিমায়
আলোকমন্ত্র জপ ক'রে চলেছে তারাগুলি
অস্তাচল থেকে উদয়াচলের উদ্দেশে॥

চি ত্রো ৎ প লা

দিগ্‌বলয়ের পরে দিগ্‌বলয়—
তারপরে দিগ্‌বলয়—
তারও পরে— তারও পরে—
ঘিরে রয়েছে মানুষের সমাজ,
মানুষের হৃদয়-দিয়ে-গড়া সংসার,
তার প্রেমঘৃণা-আশাশঙ্কা-জন্মমৃত্যু-তরঙ্গিত বেদনার
ব্যাকুল জোয়ার-ভাঁটা অনুদিন অনুক্ষণ
আর এখন এই ক্ষণটিতে।
যে দেশে, যে পথে গিয়েছি কোনোদিন,
যে অরণ্যে, যে ভূধরে,
যেখানে যাইনি যাব না কখনো,
সর্বব্যাপী জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে
সব প্লাবিত ক'রে।
যেখানে যে বন্ধু আছে, জননী আছে,
ভগ্নী আছে, সখী আছে আমার,
যেখানে যে আছে অনাম অপরিচিত অজ্ঞাত মানুষ,
এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ধুক্‌ধুকির তালে তালে
সকলের সব হৃদয় বেজে চলেছে
এই সন্ধ্যায় এই ক্ষণে।
যেন শুনতে পাই কত পরিচিত কলস্বর,
চোখ বুজে দেখতে পাই যেন কত মুখ—
ঘুমিয়ে পড়েছে শিশু ;
চন্দ্রালোকিত বাতায়নে গল্প করছে ভাইভগ্নী ;

চিত্রোৎপলা

বন্ধুর গলবেষ্টন ক'রে
বন্ধু চলেছে বকুল-বিছানো পথে ;
দীপের আলোয় করতলগত-চিবুক
বিমনা হয়ে গেছে কবি ;
সিক্ত হাস্নুহানার গুচ্ছ খোঁপায় পরিয়ে
প্রিয়াকে চুম্বন করছে বিমুগ্ধ যুবা ;
অঞ্জলিভরা ফুল ভাসিয়ে দিচ্ছে
হরিদ্বার-প্রয়াগ-কাশীর ঘাটে নরনারী ;
সাঁওতাল-কুটিরে বাঁশি বাজছে একটানা সুরে।
কিন্তু, শহরে শহরে
বিপণিচক্রে জনতার গুঞ্জন এখনও থামেনি ;
বিদ্যুদ্দীপখচিত নাট্যগৃহে লোক ধরে না ;
পুষ্পস্তবকসজ্জিত উৎসবগৃহে কলকোলাহল ;
যানস্রোত চলেছে
পদাতিক জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ;
যন্ত্রঅজগরের ন্যায় বাষ্পীয় যান
স্টেশন ছেড়ে চলেছে সগর্জননিশ্বাসে—
বহুবিভক্ত জঠরে তার বহুবিচিত্র যাত্রীজনতা
বিবাদে বিচারে আলাপে মুখরিত ;
কেবল কোন্ কোণে দরিদ্র কোন্ কেরানি
দুশ্চিন্তাপীড়িত বিষণ্ণ,
নবোঢ়া কোন্ বধূ
জননীর স্নেহ আর ভাই-বোনের মুখগুলি মনে ক'রে

গোপন চোখের জলে আঁচল ভেজালো ॥

এই মুহূর্তে—
গৃহহীন আশ্রয় পেল কি বিদীর্ণ দেউলে ?
দরিদ্র ভুলল কি তুর্ভিক্ষক্লেশ ?
কামুক ভুলে গেল ক্লেদাক্ত কামনা ?
ক্রোধীর অন্তরে শীতল হ'ল দাহ ?
ভক্তের ধ্যানে দেখা দিলেন দেবতা ?
বিজ্ঞানীর জ্ঞানে ধরা দিল নবসত্য ?
যোগীর চেতনা লীন হল বিশ্বচেতনায় ?—
দূর শূন্যে তাই সত্তউদিত সপ্তর্ষি হলেন প্রসন্ন ?
নিশ্চিত বাস্তব অথবা
নিশ্চিত কল্পনা নয় কিছুই ॥

অসীম আকাশ অসীম পৃথিবী ফেলে
ফিরে আয়, মন, এইখানে
ফিরে আয় তবু।
এই যে
মল্লিকার কুঁড়ি ফুটে উঠল কখন্
সিক্তশ্যামল পল্লবের বুকে !
নিখিল সৃষ্টিরহস্যের নিশ্বাস
গায়ে মুখে লাগে এদের লাজুক গন্ধে।

এদেরই বিকাশে
নিখিল জীবনবিকাশের ছন্দ।
শুক্ল নবমীর বিধৌত জ্যোৎস্নায়
এদের মুখ চেয়ে
আপন-মনে বলেন বিভু ভগবান-
খুশী হলাম আমি,
খুশী হলাম ॥

বোলপুর
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

সুনন্দা

শাল-সহকার-মহুল-শিরীষের ঘনছায়া-বিছানো পথে
একা চলেছ তুমি অন্যমনে—
বৃষ্টিবিন্দুখচিত কুর্‌চির গুচ্ছ তোমার কালো কেশে ;
আরক্তসীমা পীত শাড়ি তোমার তনু দেহে ;
দেখে মনে হয় না সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা—
মনে হয় ঘৃতদীপের সঞ্চারিণী শিখা,
কখনো বাতাসে কাঁপে না।
শিয়রে তোমার বনের ভিজে অন্ধকার
আলোকিত হয়েছে কৃষ্ণচূড়ার প্রফুল্ল ফুলে ;
তুমি আলো করেছ পথ
দৃষ্টিতর্পণ স্নিগ্ধতর দ্যুতিতে।
পুঞ্জপল্লবে শ্যামায়িত
পরিপক্ক ফলে পাটলীকৃত
আমি আছি বৃদ্ধ বটমূলে
শুক-শালিখের কাকলিকলিত সভায়
ওদের সভ্য না হয়েও—
মনের সঙ্গে আমার আলাপ মনে মনে,
তোমারও সঙ্গে আমার আলাপ মনে মনে॥

সপ্তদশ বসন্তের একগাছি মালা কি তুমি
না মর্ত্যের মৃত্তিকাতে গড়া ঘট

অমৃতসিন্ধুর সপ্তদশ জোয়ারে
ক্রমে উঠেছ ভ'রে ?

তুমিও মানুষ তবু—
রক্তে আন্দোলিত তোমার
দুঃখসুখ, শঙ্কাআশা, বিরাগপ্রীতি।
আজ এই স্নিগ্ধ প্রভাতে
পথে পথে যখন আলোছায়ার গঙ্গা যমুনা
পরস্পর নানা ভাবে আলিঙ্গন ক'রে লীলায়িত,
আরক্ত পায়ের পাতা ডুবিয়ে চলেছ তুমি অবলীলায়,
অন্তরে তোমার আছে কি কোনো
গভীর ভাবনা, গম্ভীর আশা, অব্যক্ত বিরহবেদন ?
জান কি কোন্ রসের অতল হতে জেগে
ক্ষীণ মৃণালে ধরা পদ্মের মতো রয়েছ তুমি স্ফুটনোন্মুখ ?
জান কি কোন্ জ্যোতিষ্মান্ সবিতা
জ্যোতির্ময় আশিস্ পাঠিয়েছেন তোমায় দিনের পর দিন
উদয়াচল থেকে ?...
তুমি জান তোমার দেবদারুর ছায়া,
কুটীরের শান্তি,
বাপের স্নেহ,
সখীসঙ্গে কলোচ্ছল ক্রীড়া।
মায়ের মুখ মনে পড়ে না।
কোনোদিন গভীর রাত্রে যদি জেগে ওঠ

তন্দ্রাজড়িত চোখে দেখ,
গায়ে এসে পড়েছে বাতায়নভ্রষ্ট চন্দ্রিকা ;
মনে হয় তখন,
স্নেহশীতল স্পর্শ বাড়িয়েছেন মা লোকান্তর হতে ;
বনের বিমিশ্র গন্ধে
ছাতিম-মহুয়া বকুল-চাঁপা মনে আনে না—
মনে হয়, বিস্মৃত শৈশবে যে চুমা দিতেন জননী
ফিরে এসে ভেসে বেড়াচ্ছে তাই
সুরভি নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
রাত্রিশেষে ভেসে চ'লে যায়॥

প্রথম অরুণালোক

মনে আনে প্রথম প্রেমের অরুণ আভাস।
বেশি নয়, সাধারণ কথা দু-একটি,
অতর্কিত হাতের ছোঁয়ায় কখনো বা
অতর্কিত শিহরণ, মধুর লজ্জা—
অভিনব প্রিয়জনের সঙ্গে বেঁটে নিয়ে শুধু এই
এ যেন কোন্ হেতুশূন্য উদ্দেশ্যশূন্য সুখ।
মনের যেন কোন্ নিভৃতে
একখানি মধুচক্রে কে খোঁচা দিয়েছে ;
টপ্ টপ্ ক'রে মধুবিন্দু পড়ে তাই যখন-তখন,
সকালে সন্ধ্যায়, কল্পনায় কাজে—

চিত্রোৎপলা

কান পেতে শোন অশ্রুত গুঞ্জন
যে গুঞ্জন প্রেমের
বাক্যহারা বাণীভরা আদিম গীত ॥

ভিজে বনের পথে এখন চলেছ তুমি ;
অঙ্গে ধরেছ রক্তোপান্ত পীত বসন ;
কবরীতে পরেছ নবনীশুভ্র কুর্‌চি ;
মনে হয় না তোমায় সঞ্চারিণী লতা ব'লে,
মনে হয় সঞ্চারিণী শিখা—
স্নিগ্ধ, আর
বাতাসে কাঁপে না।
মহানিমের শ্যাওলা-ধরা গুঁড়িতে
চকিত কাঠবিড়ালির পিছনে ছুটে গেল তোমার মন,
আঁচলে ফুল কুড়িয়ে নিলে ঐ বকুলতলায়,
বসেছ তারই শান-বাঁধানো বেদীর একধারে।
মালা গাঁথবে এখন,
না, মগ্ন হয়ে যাবে বিভূতিভূষণের গল্পগ্রন্থে ?

বোলপুর
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

মৌনময়ী

বোবা সেজে বসে আছেন নিঃসঙ্গিনী পৃথিবী
অরণ্যে, পর্বতে, মরুবিস্তারে,
সপ্তসিন্ধুর কূলে কূলে ॥

অগণ্য বল্মীকস্তূপ-হেন মানবসমাজ
গড়ে তুলেছে তার গ্রাম, নগর, গৃহ—
কীটের মতো যার জীবনযাত্রা
স্বরচিত সুরঙ্গপথের
অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।
দিশাহারা হয় সাধারণ মানুষ
অনাবৃত ভুবনের পরিপূর্ণ আলোকে :
গাল দেয় তাকেই অজ্ঞেয় অচেতন মূক ব'লে
প্রাণ যার অন্তহীন নিরন্তরউৎসারিত ধারে
শ্যামল ক'রে রেখেছে অরণ্য-পর্বত,
মুখর ক'রে রেখেছে দশ দিক,
চঞ্চল ক'রে রেখেছে মুহূর্ত-পল

মাঝে-মাঝে আসে পথভ্রান্ত অতিথি—
বাউল, বেহিসাব, চিরশিশু ;

চি ত্রো ৎ প লা

নয়ন-ভরা অসীম কৌতুক ;
চরণ-ভরা অশেষ জিজ্ঞাসা ;
অভ্যাসবন্ধন ছিন্ন করে ফেলে অন্ধকীটের
মিলবে ব'লে সেই বিশ্বছন্দে
আনন্দিত যার আবর্তনে সমুদ্রে নাচে ঢেউ,
উদয়াস্তে ধায় রবি চন্দ্র তারা ॥

কারখানা-ঘরে-ঘরে ঝণৎকার ;
খনিতে খনিতে মসীশ্বসিত আর্তনাদ ;
অগণ্য পণ্যশালায় বাণিজ্য-হল্‌হলা ;
অসংখ্য রণক্ষেত্রে কামানগর্জন ।
কানে শোনে না সেই উৎকর্ণ প্রাণ ;
চিরসরণীতে ফেরে চিরজীবন ;
বাণীর প্রসাদকামনায় ব্যাকুলমনে
শূন্য প্রান্তরের আকাশে তুলে তুলে আতুর অঞ্জলি
বলে : কই গো
ক্রন্দসীবিগলিত স্বরধুনীধারা !

বোবা সেজে বসেছিল অনাত্মীয়া প্রকৃতি ;
তখন্ কথা কয় ।
প্রকৃতিরই দানে
সংসার সাজায়

চিত্রোৎপলা

প্রকৃতিকেও সাজায় আনন্দ-বাউল—
প্রেমে, করুণায়, সৌন্দর্যে, সংগীতে,
বাণীর বরণমালায় ॥

বাণীর বরণমালায় !···
হায় !
সব বাণী বাকি আছে তবু, মনে হয় ;
সব কথা বুকে ক'রে আছে আজও জননী।
নইলে স্তব্ধ কেন তালীবন
নীলাঞ্জনচ্ছবি সাশ্রু আকাশে ?—
নয়নে স্বপ্ন এনে দিয়ে বিশ্বপরিবারের
হিমাচলচূড়ায় জেগে কেন জননী,
তুষারের আস্তীর্ণ আসনে,
স্তিমিত নক্ষত্রলোকের সভার মাঝখানে ?
একাকিনী জাগেন কেন রাতের পর রাত ?

বোলপুর
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

চেরীফুল

জাপানে বড়ো সুন্দর শুনেছি
কুয়াশা-মাখা বরফে-ঢাকা শীতকাল।
কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া বয় ;
পাখি গান গায় না ;
অরণ্য খাড়া থাকে
কাঙাল কর-সহস্র আকাশে তুলে ;
স্বপ্নলোকসম্ভূত ফুজিয়ামা-শিখরে
একটু অরুণ রঙ লাগে প্রভাতে সন্ধ্যায় ;
আর, ওদের ছোটো ছোটো দ্বীপের ছোটো ছোটো গ্রামগুলি,
বেণুকুঞ্জে-প্রচ্ছন্ন কুটীরগুলি
মনে হয় পটে-আঁকা ছবির মতো
স্থানে স্থানে যার মুছে গেছে রূপরাগ।
মানুষ আগুন জ্বালিয়ে বসে ঘরের ভিতর ;
চায়ের উৎসবে মেলে অতিথি, বন্ধু ;
বাতায়ন খুলে খুলে দেখে অন্তহীন শুভ্রতা ;
রাত্রে স্বপ্ন দেখে সুখসুপ্তিতে : বসন্ত আসছে।
অবশেষে, সত্যই
বসন্ত আসে একদিন।
বসন্তের অগ্রদূত হয়ে আসে চেরীফুল॥

২

আকাশে বাতাসে যে আচম্বিত ইশারায়
বরফ বলে, আমি গ'লে যাব,
কুয়াশা বলে, আমি স'রে যাব—
পাখি তায় সাড়া দেবার আগে,
মানুষের খেয়াল না হতেই,
একদিন রাত্রে দ্বীপ জুড়ে
নিঃস্ব শাখায় শাখায় স্বপ্ন ফুঁড়ে
অসংখ্য কুঁড়ি দেখা দেয়।
তারপর একদিন প্রভাতে
জাপানময় যখন চেরীফুল ফুটে ওঠে,
সোনার মতো, চাঁপার মতো হয় আলোর রঙ,
মধুর মতো সোয়াদ—
নীড় পরিহার ক'রে বিচিত্র ডানা নেড়ে
নবরবিকে পাখি বলে, সুপ্রভাত—
জাপানের ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ
দুঃখে বা সুখে যার শীত কেটেছে
বিরহে বা প্রণয়সৌভাগ্যে
দলে দলে বাহির হ'য়ে পড়ে
মাঠে, বনে, পাহাড়ে, নদীর কূলে, সমুদ্রের ধারে,
নীল আকাশের তলায় :
ঘরে থাকতে পারে না কেউ॥

জাপানীরা গান গায় না বড়ো,
তারের যন্ত্র বাজায় ;
নাচে, হাসে, খেলা করে ;
উদ্দেশ্যহীন হয়ে চলে যায় একদিকে ;
উল্লাস করে শিশু,
উৎসব করে নরনারী,
গুন্‌গুন্‌ করে কবি,
স্কেচ্‌ করে চিত্রকর,
পাঠ ভোলে অধ্যাপক আর ছাত্র,
নির্জনে একা বসে ভাবে তাপস
বুদ্ধের প্রসন্ন মুখচ্ছবি।
ঘরে কি থাকা যায়
জাপান ভ'রে যখন চেরীফুলের শোভা—
আর, এ শোভা থাকবে না ॥

৩

ফুলের হাসি ফুলের অধরে
ম্লান হবার আগেই
দক্ষিণসমুদ্রের ওপার থেকে
আকুল এক হাওয়া বয় :
শিউরে ওঠে আকাশ ;
শিউরে ওঠে বন ;

চি ত্রো ৎ প লা

শির্‌শিরিয়ে ওঠে অসংখ্য ফোটা ফুল—
বোঁটার বন্ধনে
ধ'রে রাখতে পারে না আর আপনাদের,
হাসিমুখে প্রসন্নমনে করে আত্মসমর্পণ,
শিথিল পাপড়ি ঝরে যায় ॥

বাতাসে পাপড়ি ঝরে যায়
সকাল থেকে সন্ধে
আকাশ আকুল ক'রে ;
পাপড়ি ঝ'রে যায় দিনরাত
দেবতার হাতে যেন পুষ্পবৃষ্টির প্রসাদ
মাঠ-বাট গ্রাম-নগর কুটীর-প্রাসাদ
মানুষের ভাবনা-বেদনা কল্পনা-কাজ
কল্যাণে আশিসে শোভায় ছেয়ে ॥

সেই পাপড়ি-ঝরার
ঝড়ের মধ্যে
উৎসবের মধ্যে
দাঁড়িয়ে ওরা বলে :
ও যে বেহিসেবি যৌবনের মতো,
বীরজীবনের মতো,
কৃপণতা নেই যার,

কুণ্ঠা নেই,
পিছনে চাওয়া নেই,
মুহূর্তে বিকাশ আর
মুহূর্তেই উৎসৃজন ॥

৪

জাপানে বসন্ত বড়ো সুন্দর
যার সূচনা এত চমৎকার

বোলপুর
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

স্বপ্নভাবুক

বক্তা বালিগঞ্জের একটি নিস্তব্ধ বাড়ির নির্জন ঘরে দুপুর রাত্রে জেগে উঠেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কাল।

শ্যামঝুরি গাছ রাসবিহারী এভিনিউয়ের দু ধারে অনেক আছে, কতকটা দেবদারুর মতো পাতা, ডালপালাগুলি তারই অপরূপ বাহার নিয়ে চারিধারে ঝুলে ঝুলে পড়ে। নামটি নূতন হলেও বোধহয় সার্থক।

কী যেন স্বপ্ন দেখলাম!
শ্যামঝুরির ডালে ডালে
প্রগাঢ় সবুজ অন্ধকারে
আচম্‌কা ডেকে উঠল শালিখ টিয়ে!
আকুল কলকণ্ঠের এ কী ঐকতান!
এখন শুনছি ঝিল্লির ঝঙ্কার;
আর, মিট্‌সেফের আশেপাশে
নেংটি ইঁদুরের আনাগোনা—
ক্ষুধাক্ষুণ্ণ মনে কুট্‌-কুট্‌ ক'রে কাটছে কী!
টেবিলে ঘড়িটা টিক্‌-টিক্‌ করছে ঠিক;
কে জানে রাত কত হবে!
কালস্রোতের জোয়ার-ভাঁটায়
এক ঘণ্টা এগিয়ে বা পিছিয়ে পড়ল ও
হয়তো সে আমার তিনকড়িও জানে না;
সময়ের আপেক্ষিকতা (?)
সদা সপ্রমাণ থাকে
অনিয়মিত দম দেওয়ায়॥

চি ত্রো ৎ প লা

হঠাৎ হাওয়ায় একেবারে খুলে গেল
পুবের জানলাটা ;
কাঠ-গোলার উপরের আকাশে
জ্বল্-জ্বল্ করছে কালপুরুষ আর লুব্ধক।
এত সুন্দর রাত !
এত সুন্দর এই কলকাতা শহরেও !
ভাগ্যে এসে পড়ে না এ ঘরটাতে
রাসবিহারী বীথিকার বিজ্‌লি আলোর ছটা,
আর, দয়া ক'রে ট্রামের ঘড়্‌ঘড়ানি থামে
রাত এগারোটার পর।
তখন ঐ রাতজাগা পাখির ঐকতানে
আর কালপুরুষের দীপ্তিতে
মনে পড়ে শালবীথিকা—
শিরে শিরে তার
জোনাকির চুম্‌কি আলোর চম্‌কানি,
শীতের শেষে শিরায় শিরায় তার
নিগূঢ় রসসঞ্চারের অশ্রুত গুঞ্জর,
তারপর কত রাতের কত গন্ধউতল অনিদ্রা।
মনে পড়ে ঝাউবন—
ঝোড়ো দক্ষিনে হাওয়ায় অশরীরী হাহাকার।
হাহাকার ?— ও বুঝি গন্ধর্বকুমার হাহা-হূহু'র
শূন্যে শূন্যে চিরভ্রমণের চিরন্তন গান
বনের বেতারযন্ত্রে হঠাৎ বেজে উঠল।

সে গানে টেনে এনেছে কতবার
সুদীর্ঘ শীতল সিক্ত সৈকতে।
অন্ধকারের জোয়ারে যেমন
মাথার উপর জ্বলে নক্ষত্রলোক
পায়ের কাছে তেমনি যে জ্বলছে বিশাল সমুদ্র
কালোয় আলোয়।
ও কি জোনাক ! ও কি তারা !
ও কি সহস্রফণা অনন্তনাগের মাথার মণিমানিক
গর্জিত ঢেউগুলোর
ক্রুদ্ধ ছোবলে ছোবলে জ্বলে উঠছে ॥

অন্তরের অসীম অন্ধকারও অমনি যে
চূর্ণ আলোকের অগণ্য কণায় কণায় খচিত :
ভাবনা, বেদনা, স্বপ্ন, স্মৃতি,
কত গানের কত সুর,
কত কবিতার কত কলি,
চোখের চাউনি, কথার টুকরো কতজনের,
নেভা দীপের আলো,
শুষ্ক ফুলের বাস,
লুপ্ত সন্ধ্যার একটি কেবল রক্তরশ্মি—
সব মিলে চিরঅমানিশায়
উষার উদয় নাই হল,
আলো-আঁধারি মায়ায়

চি ত্রো ৎ প লা

কী অপূর্ব আর চঞ্চল কারু গেঁথে চলেছে
সারা জীবন আর সকল সৃষ্টি নিয়ে !
এ আসনে সুন্দর এসে বসবে কি ?—
কোন্ দেবীর শ্রীঅঙ্গ জড়াবে এই বসন ?--
এ সুন্দর রঙ্গযবনিকা উঠে যেতে
কী দেখব, ভাই ?

কেউ তা বলে না।
কপিল, কণাদ, কান্ট্, এঁরা দেখাতে চান
জানিনে এ কথাটা
জানানো যায় কত জটিল ক'রে।
শেক্‌স্‌পীরিয়ন্ ছন্দোবন্ধে
নির্বাক্ নিয়তিতটে
ফুলে ফুলে দুলে দুলে
আছড়ে আছড়ে পড়ছে শুধু
প্রগল্‌ভ মানবসমুদ্র।
সন্ধ্যার একক তারার মতো
সুন্দরই শুধু ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্।
কীট্‌স্ বা ইয়েট্‌স্‌এর আহ্বানে
বরুণলোকের বাতায়ন খুলেছে উৎসুক পরীরা,
খোলেনি অরুণলোকের দুয়ার।
গীতোচ্ছ্বসিত পাপিয়ার মতো
উর্ধ্বমুখে যত দূরেই যাক্ শেলির প্রাণ

ও কি ভেদ করবে কোনোদিন
সুদূর আর সুনীল স্বপ্ন ?
কী বিশাল বিষাদ ব্যাসবাল্মীকির গাথায় !
কী করুণা কালিদাস আর ভবভূতির গানে !
আজকের শ্রেষ্ঠকবি
পদধ্বনি শোনেন যার ফাগুন-বাতাসে
সে তো না-পাওয়া, সে তো না-ধরা ।
ব্যাকুল প্রাণের এই অশেষ আক্রন্দ
দেশে দেশে, যুগে যুগে, সকল কবির সব গানে ।
তাই ভালোবাসি ॥

কী যেন স্বপ্ন দেখলাম ॥

চিরযুগের রসসত্রে
দিনরাত্র পাত্র ভ'রে ভ'রে দিল প্রাণসাকী ;
তারই নেশায় স্বপ্নে আর বাস্তবে
ঘুচে গেল ভেদাভেদ ।
কী সুন্দর নেশা !
বুঝি ঘোর কাটে না জীবন-ভোর,
মৃত্যুঘোরে করে অন্তিম আত্মসমর্পণ
বরের বক্ষে যেন নববধূটি ।
এ নেশায় চরণ টলে না,
দেহমন উড়ে যায় আকাশপারে ;

রুদ্ধ হয় না বাক্,
বাণীর স্রোত বয় মুক্তকণ্ঠে ; আর,
উজ্জ্বল দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয় লোক লোকান্তর
স্থর ভালো স্থরার চেয়ে !
স্থর আর কথা, কথা আর স্থর,
জীবনসাগরমন্থনে উঠেছে এই পারিজাতলতা
আর তারই নিয়তক্ষরিত স্থধা ।
মর্তের পক্ষে এই তো অমৃত ॥

জানিনে কী স্বপ্ন দেখলাম ॥

কাজের দিন যায় অধ্যাপনায় ;
ছুটির দিন যায়
অনাহূত রবাহূত বন্ধুবান্ধব মিলে
এলিয়ট্-ইয়েট্স্-রবীন্দ্রনাথের পাতায় পাতায়
বাণীলোকের অলিতে-গলিতে
স্থরস্থন্দরীর হাতছানিতে ঘুরে ঘুরে ।
যেখানে-সেখানে জমতে থাকে
অর্ধদগ্ধ চুরোট আর ছাই ;
ঘন ঘন চায়ের জোগান দেয় তিনকড়ি ;
বুঝিনে কোথা দিয়ে যায় সকাল,
কোথা দিয়ে যায় তুপুর ;
কলকাতা শহরের জনস্রোত শতধারায়

কত বয়ে যায় অট্টালিকা-বাঁধানো তটে তটে
উদ্দাম করতালি হেনে ;
কোথায় দূর শূন্যে ডাকে চিল,
ওড়ে রঙ-বেরঙ ঘুড়ি ;
অবশেষে চুন-সুরকি-বিছানো মাঠ থেকে
শ্যামঝুরির দীর্ঘায়িত ছায়াটি
ঘরের দেয়ালে এনে ফেলে অস্তসূর্য ।
হয়তো তখন সভাভঙ্গ হয়,
হয়তো হয় না ॥

বৈকালিক ভ্রমণে
সেদিন পথে কুড়িয়ে পেয়েছি এক কবিকে ।
মুখ-চেনার পরিচয় ছিল পূর্বে ;
কিন্তু, কে জানত, শীর্ণ লাজুক পাড়াগেঁয়ে
ও মানুষটি আবার কবি ।
ঘরে ডেকে আনলাম ।
প্রথমে সসংকোচে,
পরে উপচীয়মান প্রত্যয়ে,
সাবেগ কণ্ঠে শোনালো স্বরচিত কবিতা গান ।
আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল চেয়ারটাতে
কী কথার কী উত্তর দেবে তাই ভেবে ;
হয়তো সংশয় ছিল, আমার
ভালো লাগবে কিনা ।

লাগল ভালো।
হিসেব-ভোলা বাউল ব'লেই মনে হল ওকে
ঘর ছেড়ে ও চলেছে যে পথে
কোথাও সে পথের নেই কোনো শেষ।
ও তা জানে। প্রাণে জড়ানো আছে ওর
অলৌকিক কোন্ তুষের আগুন।
এক প্রাণের উত্তাপে আর-এক প্রাণের তাপ
জুড়োয় কিনা কে জানে, কিন্তু,
বড়ো ভালো লাগল॥

আজ কয়েকদিন হল
একখানি চিঠি পেয়েছি ওর
শাল-তাল-মহুয়ার দেশ থেকে;
পাঠিয়েছে কবিতা আর অকৃত্রিম প্রীতি।
উত্তর দেওয়া হয়নি।
কাজের দিনে সময় পাইনে;
ছুটির দিনে বন্ধুবান্ধব-অতিথিরা
অনেক রাত্রে একে একে সবাই চ'লে গেলে
বাইরের ঘরের দরোজা বন্ধ করে দেয় তিনকড়ি,
তখন এই নির্জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে
মনে পড়ে পারসিক কবির ব্যথিত উক্তি:
চলে গেছে অতিথিরা;
পানপাত্র ফেলে গেছে পাষাণের মেজেয়;

কেউ নেই সেই হাসি সেই কলকথা জাগিয়ে রাখতে ;
ওঠ্, জামী, ওঠ্,
আবার ভরে তোল্ তোর পাত্রটা ;
কতই তো গাইলি গুণীজনসভায়,
বীণার তারে তারে গাঁথলি অশ্রুমুক্তার মালা,
এবার ঝঙ্কার দে অন্ধকারে ।
হঠাৎ মনে পড়ে বর্তমানের অনেক স্পষ্ট
অনেক দামী আর অনেক দরকারী বস্তুর
সমারোহ স'রে গিয়ে
বিস্মৃত একটি বিকালবেলা,
একখানি অবনত মুখ,
একটি ছলোছলো দৃষ্টি—
যুগান্তরে যে কিশোরী
প্রেমে পুণ্যময় করেছিল যুগ্মদেহমন,
স্বয়ম্বরের মালা তার গাঁথা শেষ না হতেই
হঠাৎ ছিঁড়ে ফেলে দিল নির্মম নিয়তি ॥

বহু বৎসর পরে
স্বপ্নে আজ এসেছিলে, কল্যাণী—
সেই মূর্তি, সেই বেশ ॥

বোলপুর
২০ আশ্বিন ১৩৪৪

কবি

কবি সুরেশ্বর শর্মা কাব্য নাটক লেখেননি যে তা নয়, বিভিন্ন রাশিচক্রের দুর্লভ যোগাযোগ হয়েছে যে সময়, কিন্তু প্রকাশ করেননি একছত্রও। উইয়ে-কাটা দু-একখানা পাতা মাঠাকরুনের ঘুঁটের ঝুড়িতে হয়তো মিললেও মিলতে পারে।

সেই পুরোনো সুরেশ্বর শর্মা,
অন্য কেউ তো নই আমি।
ভেবেছিলেম কাল রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বার আগে,
হয়তো আজ ভোরে উঠে দেখব আর-কেউ।
নাঃ, এ তো সেই মানুষ।
সেই আয়ুভারাতুর দেহ ;
সেই অবাধ্য অবোধ মন ;
সেই চা আর তামাকের তৃষ্ণা ;
সেই চাকুরির শুষ্ক রুটিন-পথে
বিশ্রামশূন্য পরিক্রমণ।
কেন এমন হয় না ?—
আজ হলেম আমি বৃদ্ধ ;
কাল হলেম শিশু।
কখনো সন্ন্যাসী ; কখনো সৈনিক ;
কখনো হলেম অন্ধ ভিখারি।
কখনো মেঘ ; কখনো পাখি ;
কখনো হলেম একবেলার ফুল।

দূর্বাবনের ফড়িঙ কখনো ;
পদ্মপাতার শিশির কখনো ;
কখনো শুক্লরাতের খ্যাপা দখিনায়
বনে বনে ফুলের সুবাস, পল্লবের দোল,
চন্দ্রিকার চমক উপরে-নিচে ।—
অথবা, এইরকমই একটা সকাল
শিশিরে-ভেজা ধানক্ষেতের উপর,
নেবু-করমচা-করবীর আড়ালে-আবডালে,
নীলাকাশে আর বকের পালখের মতন মেঘে
দিগ্‌বিদিকে আলোছায়ার চঞ্চল মায়ায় পরিব্যাপ্ত ।-
নয়তো হিমাচলের একটা চূড়া
কটি পর্যন্ত বসন জড়িয়ে
পাইন দেওদার আর ভূর্জবনের,
একা-একা বসে আছি
আকাশধরিত্রীর মাঝখানে ;
শিয়রের পুঞ্জিত তুষারে
যুগ যুগ ধ'রে প্রতিফলিত হচ্ছে
প্রভাত, প্রদোষ, রাত্রি ॥

ছিন্নবিচ্ছিন্ন পুরোনো পাঁজির মতো
ভালো লাগে না নিত্য সেই একই
সুরেশ্বর শর্মাকে ।...
পুরোনো তো—

অন্তরে তবু আজও
ছলনাময় নিত্যনূতনের
কেন এ হাতছানি ?

তাই ভালোও লাগে—
এখানকার এই যে মাঠ, সবুজ, ধানে-ভরা,
দিক্‌সীমার দিকে ক্রমশ উঠে গেছে উদ্‌গ্রীব ঢেউয়ের মতো ;
তারই উপর আশ্বিনের এই ভোরবেলা,
শিশিরে ছলোছল্, আলোয় ঝলোমল্ ;
ঘরের পিছনে অশথের মাথায়
ছু-একটা ডানার ঝট্‌পট্, কাকের কা কা—
এ ছাড়া সাড়াশব্দ নেই।
এও ভালো লাগে—
অনেক— অনেক দূর থেকে ভেসে আসা
সানাইয়ের সুরে,
আরতির শঙ্খঘণ্টারবে,
জলের কলকলস্বরে আর
পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে—
সু !
সে ডাকল না ?...
না, না !
কবে ছেড়ে এসেছি শান্তিপুর।
কতদিন হল নেই আর ডানপিটে প্রবীর !

বুড়োবটের ঝুরিতে বাঁধা নৌকোখানা খুলে
অকারণ আর তো যাব না
চরের ঝাউবনে ;
দুপুর পেরিয়ে, বিকেল পেরিয়ে,
শেষ বেলায় ঘরে ফিরে এসে
দুজনে ভর্ৎসনা সইব না স্বজনপ্রতিবেশীর ॥

অলস অন্যমনস্ক মনে কে
খুলে খুলে দেখায় কেন যে
অতীতের বিচিত্র চলচ্ছবি।
চৌবাচ্ছার জল মাথায় ঢালতে গিয়ে
সাঁতার কাটি তাই গঙ্গায় ; আর,
হঠাৎ ঠিকে ভুল হয় হিসেবের খাতায়।
হায় রে, অন্ধকার-করা বাঁশবনে,
ভাঁটফুল-সুগন্ধি ভাঙাবাড়ির কোণে
গুটিকয়েক বন্ধু মিলে দেশোদ্ধারের
অসম্ভব পরিকল্পনা এ নয় ; মাসান্তে
শান্তিনিকেতন-সমবায়-ভাণ্ডারের
বিল বার করার উদয়াস্ত খাটুনি ॥

দৈনন্দিন রুটিন-পথে যেতে যেতে
আড়চোখে দেখি, একালের মানুষ
কী চোখে দেখছে সেকালের

বোর্খা-ঢাকা এই প্রাণ।
কাজের মাঝে-মাঝেই
ছোটো ছেলে আনে উপদ্রব ;
ছোটো মেয়ে চায় আদর কাড়তে ;
তরুণ-তরুণীর দৃষ্টিতে থাকে প্রচ্ছন্ন আস্বাদর ;
বুড়োরা ভাবে পক্ককেশে আর বাঁধানো দাঁতে
ও বুঝি তাদেরই একজন।
কেউ তো জানে না—
আশৈশব স্বপ্ন দেখা ওর স্বভাব
জেগে জেগে।
আজও থেকে থেকে
শ্যামার মতো দেয় শিশ ;
ফিঙের মতো ওড়ে ;
বালুবহ স্রোতে রুপালি মাছগুলির
ঝিকিয়ে-ওঠা চটুলতায় হয় খুশী ;
শিউরে ওঠে
শীতশেষের নিশীথআকাশে
কৈলাসে-ফেরা রাজহংসশ্রেণীর
গম্ভীর ডাকে ;
শ্মশানের নেড়া গাছে
শকুন বসে থাকে সন্ধ্যায় সমাহিত—
ও ভাবে, অঘোরপন্থী সাধু,
মহাত্মা॥

কিছু কিছু বোঝে এ-সব
চঞ্চল— সে
কিশোর, কবি।
তবু তো বোঝে না, মানুষ চেয়ে
কত শতগুণে শ্রেষ্ঠ পাখিরা।
দেয়াল তুলে বাস করে মানুষ
স্বরচিত কারাগারে ;
ভাইয়ের রক্তস্রোতে ধোয় ধরাতল ;
তারই উপরে গাঁথে দেব্‌তার দেউল ;
ঈর্ষায় শঙ্কায় লোভে ক্ষোভে
পীড়ন করে আর পীড়িত হয়।
আর, ঐ পিক পাপিয়া ?-
গানে গানে মুখরিত তাদের সুধাধৌত নিশীথিনী।
যাযাবর মরালযূথ ?—
অক্লান্ত ডানায় দিনে রাতে পাড়ি দেয়
দিক্‌সীমা-হারানো আকাশপারাবারে।
নিঃসঙ্গ, নির্‌ঘৃণ শকুন।
এত্তটুকুন মৌটুস্‌কি পাখি
শিরীষফুলে-ফুলে উড়ে উড়ে খায় মধু।
ওরাই জানে, ওরাই বোঝে,
যেখানে স্বাধীনতা সেখানে সুখ,
জ্ঞানের ধ্যানের অবধি সেইখানে॥

চি ত্রো ৎ প লা

মানুষই পৃথিবীতে
নিষ্ফলতার মালায় জপে
সুখের আর দুঃখের স্মৃতি :
ব্যর্থ আশায়, বৃথা কী শোচনায়
তাকায় সমুখে, তাকায় পিছনে ;
দিন মাস বর্ষ গুনে গুনে
বোঝা বাড়াতে চায় বয়সের ;
সৌন্দর্য চায় চিবিয়ে খেতে
প্রেম দিয়ে বানায় নিগড় ;
ভাব, অনুভূতি, স্বপ্ন, সাধ,
অন্তরের অন্তরতম যা-কিছু ধনে
ভাষা দিয়ে, অভিধান দিয়ে,
দর্শনে, কাব্যে, ব্যাখ্যায়, বিশ্লেষণে
দূর আর পর ক'রে দেয় নিঃশেষে।
প্রাণসম্বন্ধ হয় না সহজ ;
বোঝে না যে, কেউ নয় প্রভু, কেউ নয় ভৃত্য,
একই লক্ষ্যের যাত্রী যারা সব
বিচিত্র ছন্দে বিবিধ পথে।
মানুষ কি বোঝে ?
আমিও তাই
পীড়া পেয়েছি কত, পীড়া দিয়েছি ;
আপন করতে তো পারিনি
পথের সেই চিরপথিককে।

যে ছেলেকে মনে-মনে ভেবেছি
বন্ধু আর সাথি, তার বেশি নয়,
অতর্কিত মৃত্যুবিচ্ছেদে তারই
জানিয়ে দিয়েছে, সে
কত যে দুস্ত্যাজ্য আমার,
কতই বেশি !
শোভাময় সুখময় এই ভুবনে
মানুষকে তবে কি
চরম অধিকার দিল বিধাতা
দুঃখদহনের ?
পরিণামে কী সুখ পায় সে কে জানে,
কণ্টকের মুকুট মাথায়, রক্তাক্ত ক্রুশে
দেহ প্রাণ উৎসর্গ ক'রে দিয়ে !
জেনেও জানিনে আমি তা :
সাধক নই, সেবক নই ॥

ক্ষুদ্র যে ফুলগুলি ঘাসের বনে বনে
না দেখে দ'লে যায় পথিকেরা,
শোভায় সুগন্ধে মধুতে
সুসম্পূর্ণ সেও এক জগৎ—
কীটঅধিবাসী সেখানকার,
আয়ু আর সুখ আর সার্থকতা
কম কী তাদের মানুষের চেয়ে ?

রহস্যময়ী প্রকৃতির এ রহস্য শুধু বুঝি,
লাবণ্যে দীপ্তিতে হয়ে উঠল সুন্দর
যখনই যেখানে,
পূর্ণস্তনী হল উপজাত উপচিত স্নেহে,
জন্ম নিল জীবের জীবন ;
নইলে
কে দেখবে সে শোভা ?—
কে সম্ভোগ করবে সেই স্নেহ ?
গৌরীশঙ্করের অকলঙ্ক তুষারে
নিশ্চিহ্ন চরণ ফেলে
সূক্ষ্মকায়া পরীরা ফেরে না, কে বলে ?
কে বলে, চয়ন করে না তারা
প্রভাতসন্ধ্যার মেঘে মেঘে
কনকারুণ প্রফুল্ল প্রসূন ?
কে বলে, প্রজ্বলন্ত তপনের
সহস্রযোজনবিসর্পী শিখায় শিখায়
অগ্নিময় প্রাণীরা ফেরে না আনন্দগান ক'রে
নিশাশূন্য চিরযুগ চিরদিন ধ'রে ?
সাধ যায় শুধু,
স্বপ্ন দেখি, আমার
এ জীবন যদি শেষ হয় এইখানে,
অন্য জীবনে যেন অনন্ত নীলিমায়
সখা হই চিরচারণ ঊনপঞ্চাশ পবনের।

নয়তো সূর্যের
নয়তো নক্ষত্রের
প্রদীপ্ত অন্তরে
শাশ্বত উদ্গাতা হই অগ্নিসামের ॥

আহা, একি !—
চা দিয়ে চলে গেলেন,
ব'লে গেলেন না কেন !
কখন্ জুড়িয়ে গিয়েছে ॥

বোলপুর
২৩ আশ্বিন ১৩৪৪

মাঠাকুরানী

আমার চঞ্চল বলে,
শেষ শরতের এই রোদ
লক্ষ্মীঠাকরুনের রাতুল দুটি চরণের আভা।
দেখো-না, তাই মাঠে-মাঠে
কেমন করে ধান পেকে উঠছে দিনে-দিনে ;
গেরস্ত চাষি সে ধান গোলা ভরে রাখবে—
আর, চঞ্চল শুধু কমলার কমলচরণের
ঐ আভাই ভরে ভরে রাখল মনে।
পাগল ব'লে ওকে বকিঝকি
কিন্তু পাগলামির কথাও তো সুন্দর,
যখন এইরকম বেলা দুটোয়
হঠাৎ একদিন অবসর হয়েছে, আর
মনে হয়, ধূপধুনোর
গন্ধ আসছে কোথা থেকে।
পুজোর তো আর দেরি নেই ;
আগমনীর সুরে দু দিন বাদেই বেজে উঠবে
নবত থেকে সানাই॥

পুজোর কাছাকাছি এই দিনগুলি
কী যে ভালো লাগে!

মনে পড়ে, সেই কবেকার
বাপের বাড়ির কত কথা—
বাপের আদর ; মায়ের ভৎর্সনা,
চুলের ঝুঁটি ধ'রে দুম্ ক'রে একটা কিল,
হঠাৎ মনে হলে, আহা,
সেও কত মিষ্টি লাগে আজ !
সে বাপ নেই ; সে মা নেই ;
চিরদিনের জন্যে মুছে গেছে
বাপের বাড়ি যাবার রাস্তা ;
ভাইয়েরা কে কোথায় থাকে ;
খোঁজ খবর নেয় না—
গরিব আর অক্ষম দিদি
কেমন ক'রেই বা তত্ত্ব নেয় তাদের ॥

পুজোর জন্যে শিউলিফুল কুড়োই
সকালবেলা···
চঞ্চলের পোঁতা ঐ গাছটিতে
এবারেই ফুল ধরল দেখি !
সুমুখ-জ্যোৎস্নার রাত্তিরে
ডালে ডালে ওর কুঁড়ি ফুটে উঠল ফুট্‌ফুটে শোভায় ;
বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে তারই সুন্দর গন্ধ ;
রোজ সকালে
খই-ছড়ানো কী সুন্দর শোভা

উঠোনের মাঝখানটিতে।
চঞ্চল বলে, পূর্বজন্মে
অরুণলোকের পরী ছিল ওরা কিনা,
এ জন্মেও পুজো-ভরা ধব্‌ধবে রূপের
বোঁটায় বোঁটায় একটুকু অরুণ রঙ লেগে আছে,
সূর্যের আলো না ফুটতেই
সে আলো পা ফেলবে ব'লে ঝরে ঝরে পড়ে,
শিশিরের ছল ক'রে সুখেতে কাঁদে।
মা গো, বানিয়ে বানিয়ে এত কথাও বলতে পারে।
কর্তাকে জিজ্ঞেসা করি তবু, "হ্যাঁ গা,
এ-সব সত্যি ?"
শুনে তিনি হেসে ওঠেন॥

ফুল কুড়োই, আর মনে পড়ে,
আগেও এমন ফুল কুড়িয়েছি ;
বোঁটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে শুকিয়ে রেখেছি,
পুতুলের জামাকাপড় রঙিয়ে
দূরের-জলের ছেলের সঙ্গে
আমার মেয়ের বিয়ে দেব ব'লে।
কন্টিকারি বন-নোটে আর মুক্তোবর্ষির
পাতা ফুল ফল ছিঁড়ে
দুটি সইয়ে খেলা করেছি, তখন
ভেবেছি কি এত ঝড়ঝাপ্‌টা জীবনে-

এত অদলবদল—
মা হওয়ার এত সুখ আর এতই জ্বালা ॥

এ বেলা উনি খান না,
আমারও মঙ্গলবার ;
খোকা আর চঞ্চল তুজনে মিলে
কিছুতেই রাঁধতে দিলে না ;
সকলেরই ফলার হল আজ চিঁড়ে-তুধে ।
এক দিনের রেহাই ।
বুড়ো হাড় নিয়ে পারিওনে, বাপু,
নিত্য নিয়মিত খাটতে ।···
শীতের জন্যে এ কাঁথাটা
আজই শেষ করে ফেলতে হবে ।
ফোঁড় তুলি আর ভাবি
পুরোনো দিনের পুরোনো কথা ।···
বকতে আমি নাকি ভালোবাসি,
অনুপস্থিতের উদ্দেশেও কত কী কথা বলি ;
ছেলেদের পড়াশুনোর বুঝি ব্যাঘাত হয়
তা, করুক ওরা এম-এ পাসের পড়া, আঁকুক ছবি,
মাঝে-মাঝে বসব গিয়ে ওদের কাছে ;
মোটেই কথা কব না ।
তাও বলি,
এত পড়া কি ভালো ?

চি ত্রো ৎ প লা

গরিবের ঘরে কী বা খাওয়াতে পারি ওদের ?
খোকার চোখ খারাপ ;
শেষে অন্ধ হবে যে !— বারণ করলে
কথা তো শোনে না ॥

উনি ঐরকম !
এক-একটা খেয়ালের পিছনে ধাওয়া ক'রে
কত যে অর্থ সামর্থ্য আর সময় নষ্ট করেছেন
সীমা নেই তার ।
বাচ্ছাকাচ্ছার কথা ভেবে—
আজ নাহয় ওরা বড় হয়েছে—
ঝগড়া করেছি, উপোস করেছি,
ঘরের দুয়োর বন্ধ ক'রে
মিথ্যে কেঁদেছি কত ।
আজ দেখি, আমার দুঃখে উনি সারা হন,
আমার মুখেও চান !
আগে এমন ছিলেন না ।···
সোনার গৌরাঙ্গের মতো কী রূপ ছিল !
কী তেজ ছিল !
নতুন বউটি ছিলেম যখন
ভালো ক'রে চাইতেও পারতেম না মুখের বাগে !
হেসে কথা কইতেও জানতেন অথচ ;
দূরের-জলের উপ্‌রোধে অনুরোধে

গান গেয়েছেন কত।
স্বপনের মতো মনে হয় সে-সব দিন ॥

চার ছেলেমেয়ের মা আমি।
বড়ো সংসারী, কাছে থাকে না;
ব্রহ্মপুত্রের ওপারে অন্তরীন ছিল খোকা,
এই তো সেদিন ঘরে বন্দী করেছে।
সবাই একরোখা, সবাই রাগী;
ভক্তি করতে ভালো বাসতেও যত
ধমক দিতেও তেমনি।
আমার মতো ক'রে ওরা তো দেখবে না কিছু;
আমার দুক্‌খু আমার সুখ বুঝবে কী ক'রে?
সে বুঝত আমার বিশু—
কোল শূন্য ক'রে ভগবান যাকে কেড়ে নিয়েছেন।
পোড়া চোখের জল
এখনো কি বন্ধ করতে পারি?
না আমার হারামণি—
চার বছরের সেই খুকু
তারও ফুট্‌ফুটে মুখখানি
হঠাৎ চোখে ভেসে ওঠে না?
আহ্নিক করতে ব'সে এক-একদিন
ভগবানের নাম জপি না ওদেরই নাম জপি,
বলতে তো পারিনে।

অপরাধ হয় কি এতে ?
কী ক'রে ভুলি ?
কী ক'রে দূর করি মমতা ?
দুঃখে শোকে হাহাকার করে যে বুক
শুধু ঠাকুরকে দিয়ে ভরাতে পারিনে সে তো—
অজ্ঞান মেয়েমানুষ আমি !
একটি ছেলে হারালে
পথ থেকে আর পাঁচটি ছেলে ডেকে এনে
বকি-ঝকি খাওয়াই-দাওয়াই—
অপরাধ হয় কি এতে ?
এরাও কি ঠাকুর নয় ছেলে ব'লেই ?
তোমরা তো জ্ঞানী, তোমরা ভক্তিমান,
আমায় বলো-না গা ॥

হাঁটুতে ঝিন্‌ঝিনি ধরল উবু হয়ে ব'সে ।
ঘাড়েও লাগছে ।
আজকের মতো রইল কাঁথা ।···
ও মেনি, কোথা গেল রে তোর মা ?
বড়ো বোন তুই, কচি ভাইবোন ক'টা
উনোনের ভিতর চিঁ চিঁ করছে যে,
নিশ্চয় খিদে পেয়েছে—
ডাক্‌-না মাকে !
ও বুঝি সেই পাত্র !

আর্‌সোলা কি গির্‌গিটি ধরবার চেষ্টায় ঘুরছে।
ভুলেও যদি ইঁদুর ধরে!
লুকিয়ে-লুকিয়ে দুধভাত খেতে দিই দুটি
ধাড়ি বেড়ালটাকে—
নইলে মাইয়ে দুধ হবে কেন?
ভোরবেলা সে যদি দেখো—
কাঠের উনোনের ছোট্ট খোলে
চার মায়ে-পোয়ে ঘেঁষাঘেষি হয়ে থাকে,
ঢেউয়ের মতো বাচ্ছাগুলো গায়ে-মাথায় ওঠে-পড়ে,
মা'টা তখন চোখ খোলে না ;
ঐ চোখেই দেখো. কত সোহাগ কত গরিমা
জ্বল্‌জ্বল্ ছল্‌ছল্ ক'রে ওঠে থেকে থেকে।
দূর থেকেই কান খাড়া ক'রে থাকে
ওদের ডাকে। চোখ ফুটলেই
মুখে করে টেনে টেনে ফিরবে—
কোথায় কেমন ক'রে ওদের রাখে
সব-কিছু অনিষ্ট আপদ থেকে আগলে,
একদণ্ড তাই কি সোয়াস্তি আছে॥

ঝি এখনো এল না।
নাম বটে 'সম্পত্তি',
ভালো বিপত্তি হয়েছে আমার তাকে নিয়ে
বেশ দু কথা শুনিয়ে দেব এলে।

মাইনে তো আগাম নিয়েছে ;
পুজোর কাপড় কক্ষোনো দেব না—
কাজ করুক অন্য কোথাও গিয়ে।...
হ্যাঁ মা, এত দেরি কি করতে হয় ?
ঝাঁটপাট, জল তোলা, কত কাজ—
তোমারই তো কষ্ট হবে ; আমার কী বলো দেখি
আর দেখো, ও কাপড়খানা পছন্দ না হয়
ডুরে শাড়ি তুমি নিজেই কিনে নিয়ো,
আমি দাম দেব—
পুজোর দিনে আহ্লাদ ক'রে পোরো
আমার ছেলেদের কল্যাণে ॥

যাই জল খেতে দিই ছেলেদের ;
রান্নার জোগাড় দেখি।
কাপড় ছেড়ে কালকের দুর্বো তুলতে হবে।
তারপর উনি আসবেন শাঁকে ফুঁ দিয়ে
তুল্‌সিতলায় পিদিম জ্বালা হ'লে পর।...
মনে পড়ে আমার গুরুঠাকুরের কথা !
তিনি তো মানুষ ছিলেন না।
জপে বসলে দু চোখে ধারা বইত ;
জপ শেষ হ'ত না।
দুপুরে ভাতের থালা সুমুখে নিয়ে
হেসে হেসে কী যে কথা কইতেন—

ভাত মুখে তুলতে গিয়ে এঁটো করতেন সর্ব অঙ্গ ;
শেষে ছেলের মতো ধ'রে খাইয়ে দিতে হ'ত
পুজোর সময় আসতেন।
কত বছর হ'ল আর আসেননি।
শেষ বিদায়ের দিনে আশীর্বাদ করে গেলেন,—
'রাধাগোবিন্দপদে ভক্তি হোক তোমার !'
সে ভক্তি হ'ল কৈ।
সন্ধ্যাবেলায় তুল্‌সিতলায় মাথা ঠেকাই আর বলি :
হে গুরু,
হে জীবন্ত ঠাকুর,
হে দুর্লভ ভাবের মানুষ,
নিরুদ্দেশ পথে চলে গেলে ; আর কেন এলে না ?
সেই পথের পানে ফিরিয়ে এই প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছি,
তুমি আর-একবার এসো।
স্বামীপুত্র রেখে
শেষ চোখ বুজব আমি যেদিন ॥

বোলপুর
২৪ আশ্বিন ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ

মনে পড়ে প্রস্ফুট পদ্মের মতো
পদ্মার স্রোতে ভাসানো তোমার দিনগুলি, হে কবি।
ভাবি, তেমন দিন আর কি কখনো হবে ?
তেমন প্রভাত ?   তেমন সন্ধ্যা ?
সেই কূলপ্লাবিনী উন্মাদিনী নটী
উত্তাল তরঙ্গমৃদঙ্গের কলরঙ্গে বহমানা ;
সেই জনপদগ্রাসিনী সর্বনাশিনী ভৈরবী
রৌদ্রদীপ্ত তরবারির মতোই শাণিত খরধার ;
সেই সমুদ্রস্বয়ম্বরা অভিসারিণী,
আশ্বিনপূর্ণিমায়
স্বপ্নবিহ্বলা, অবলুপ্তসীমা,
আবেগ-অবরুদ্ধ-গদ্‌গদবাণী—

সেই পদ্মা
দিগন্তবিসর্পিত ইঙ্গিতে যে
ডেকে নিয়েছিল তোমায় আপন বক্ষের
নিরন্তবেগবান্ ছন্দোহিন্দোলে ;
করতালি হেনেছিল সপ্রেম সোহাগে
তোমার তরণীর সর্ব অঙ্গে ;
আস্তীর্ণ করে দিয়েছিল

উর্মিল বালুকার সুধাশুভ্র আস্তরণ
দিক্‌হীন চরের জনশূন্য উদাসী ঝাউবনে ;
শুক্রসমুদিত সন্ধ্যায় তোমার
নিস্তব্ধ ধ্যানের কিনারে গেঁথেছিল
অনাদি ঋকের মৃদুমন্দ উদ্‌ঘোষণ-

তোমার সে পদ্মা আমি তো দেখিনি, কবি
কেউ কি দেখেছিল ?

কুণ্ঠিত বধূ
ঘট ভ'রে নিতে এসে তুটি বেলা
অবগুণ্ঠিত তুটি কৃষ্ণতার চক্ষুর
কৌতুকোড্ডীন ভীরু দৃষ্টি মেলে
ভেবেছিল, ওমা, এ কী !
রাজবজরা বাঁধল কে
কেন
আমাদের এ মৃন্ময় ঘাটে ?
ঘাট থেকে
সিক্ত চরণের চিহ্ন এঁকে
মুঞ্জরিতচূত ঘনচ্ছায়া-বিছানো পথে
ক্বণিতকঙ্কণে যেতে যেতে
ভেবেছিল, এ কী রূপ !

ভেবেছিল নারিকেলকুঞ্জের অধীর
আলো-ঝিলিমিলিতে,—
তুধে আলতায় ধোওয়া, মরি, কী কান্তি!

সেদিন কেই বা জানে,
হে সৌম্য, ছিলে না
দ্বাদশ-দেউলের ঘাটের সন্নিকটে
সুপ্ত রাজহংসের মতো নিস্তব্ধ তরণীর নির্জন ছাদে?
সর্ষেক্ষেতের সুহাস্যচ্ছুরিত চৈত্রদিনে
অন্তিম যে রবিরশ্মিটি
শেষ স্মিত শিহরে
বিদায় নিয়ে গেল প্রবাহবক্ষ থেকে,
নারিকেলবনের মৃতুআন্দোলিত শত শীর্ষ থেকে,
স্তব্ধ মেঘের কিনারে জড়িয়ে রইল জরির মতো
তাই বা কতক্ষণ—
সোনার তরীতে তারই
অকূলে ভেসেছিলে তুমি, হে চিরযাত্রী,
অলৌকিকের উদ্দেশে।
আর কি ফিরেছিলে?

কেবল
ভাঁটার স্রোতে স্বর্ণশস্যে-ভরা
অন্য তরী তোমার একটার পর একটা

ফিরে এসেছে সংসারের ঘাটে,
আনন্দক্ষুধায় উদার দাক্ষিণ্য তোমার
যেখানে লুটে নিল ব্যাকুল নরনারী—
যুগযুগান্তর নেবে লুটে ॥

তুমি কি একা তোমার পদ্মার স্রোতে ?
চিরদিন একা তোমার সঙ্গীতের স্রোতে-
কল্পভুবনে ?
অতিশয় কাছে আছে যারা তোমার
প্রবেশহীন তারাও নির্বাসিত।
আকাশের মতো, গিরিশৃঙ্গের মতো,
রাজার মতো
স্বজনসঙ্গহীন তুমি—
একা ॥

রাজার মতো একা ?—
জানি গো কবি,
অকূল-পদ্মার-নৃত্যে-আন্দোলিত
অসীম-আকাশের-দর্পণে-প্রতিবিম্বিত
তুমি আর তোমার সে দিনগুলি
শুধু দিবসস্বপ্নের ধন আমার ;
আমি তো ছিলেমও না
সেদিন এ পৃথিবীতে।

স্বপ্নমোহে তবু অহেতু মনে হয়—
রাজা বটে, রাখালরাজা ছিলে
জানিনে কোন্ ব্রজে।
কেলুবনে কদম্ববনে
মধুনিষ্যন্দিত তোমার বেণুস্বনে বয়েছে
কোন্ কালিন্দীধারা উজান খরস্রোতে।
খেলেছি তোমার সাথে ;
মেলেছি কিশোর-প্রাণের হাসি কান্না কৌতুক ;
ঝাঁপ দিয়েছি যমুনায় আর
কমলব্যাকুল কালীদহে ;
শুক্লযামিনীতে গেয়েছি গান
উৎফুল্ল ঐকতানে।
স্বপ্ন এ কি ?

সত্য এ কি—
মথুরার রাজা তুমি আজ
অসীম ঐশ্বর্যলোকে একা ?
দ্বারের বাহিরে ঠেকিয়ে রাখে তোমার
অপরিচিত দ্বারী।
হে কবি, নিয়ো তুমি উদ্দেশে নিবেদিত
এই চির-ভালোবাসা ॥

বোলপুর
২৬ আশ্বিন ১৩৪৪

জিজ্ঞাসা

কাতারে কাতারে চলেছে মানুষ মরণযজ্ঞে।
ন্যায়ের জন্যে নয়,
ধর্মের জন্যে নয়,
বিজয়গৌরবের জন্যে নয়,
স্বেচ্ছায় নয়—
বিতাড়িত বলির পশুর মতো মূক নিঃসহায় ব'লে ॥

মুষ্টিমেয় মানুষের সীমাহীন অর্থগৃধ্নুতা
সমুদ্রের এ পারে বিষবাষ্পনিশ্বসিত সহস্র কারখানায়
অগণ্য মানুষের দেহমন নিষ্পেষিত ক'রে
উৎপাদন করেছে মূল্যহীন ঠুন্‌কো জিনিসের অজস্রতা—
উৎপাদন ক'রেই চলেছে
গর্জিত কামানশ্রেণীর অগ্নিবর্ষণের পিছে পিছে
সমুদ্রের ও পারে তার আড়ম্বরপূর্ণ আপণ সাজাবে ব'লে ;
চাতুরীপূর্ণ প্রবঞ্চনায় হরণ করবে ব'লে
ওদের সামর্থ্য, ওদের শস্য ;
ওদের জন্যে ভূমির স্তরে স্তরে
ভূমিলক্ষ্মী যে দান রেখেছেন সঙ্গোপনে
নিঃশেষে তাই লুণ্ঠন করবে ব'লে
দানবের মতো তীক্ষ্ণধার সহস্র দংষ্ট্রায়
ভূপঞ্জর বিদীর্ণ ক'রে ॥

ধনীর হিসাবের খাতায় জমার ঘরে
অঙ্কগুলো ছুটে চলেছে রেসের ঘোড়ার মতো
দূন থেকে চৌদূন তালে।
কোনো প্রয়োজন নেই—
কোনো অর্থ নেই ব'লেই
নেশায় বুঁদ হয়ে উঠেছে জুয়াড়িরা।
হতভাগ্য তারা বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে যাদের,
স্ফুলিঙ্গবর্ষী ক্ষুরে ক্ষুরে কুঁড়েঘর জ্বালিয়ে দিয়ে,
ছুটে যায় গতিউন্মাদ অর্থলালসার রেসের ঘোড়া
তার চেয়ে হতভাগ্য যারা নিষ্ফল বিদ্রোহ করে ;
দুর্বল বুকে বুকে বাঁধ বেঁধে ঠেকাতে চায়
দুর্বার উন্মত্ততা ॥

তবু তো দাঁড়ালো চীন
মর্‌চেধরা জীর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে শান দিয়ে,
ছিন্ন বর্মে সুবিশাল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে,
নির্বান্ধব অথচ নির্ভীক বেশে।
ধন্য সে বীর!
ধন্য দুঃসাহসী ॥

তাই এ সংগ্রাম।
দাবাগ্নির মতো তাই এ লেলিহ লক্ষ শিখা জ্ব'লে উঠল
হিংস্র ভীষণ মরণযজ্ঞে ॥

পরাধীন ভারতের এক প্রান্তে ব'সে ভাবি—
চীন-জাপানের ঘরে ঘরে আজ
মায়ের কত অশ্রু, প্রিয়ার কত দীর্ঘশ্বাস, বোনের কত বেদনা
প্রবাহিত পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে দিনে দিনে।
কে তার হিসাব রাখে ?
খবরের কাগজে আর লোকের মুখে মুখে প্রচারিত
কদর্য কত কুৎসা, গ্লানিকর কত কাহিনী।
সভাস্থলে হাটে বাজারে
বিভ্রান্ত জনসংঘের উচ্চণ্ড আক্রোশ, উন্মত্ত ক্ষোভ ॥

শরতের নীলাকাশ আর ভরা ক্ষেত-পানে চাই,
ভাবি, এ শরৎ একান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল বিশাল ভূভাগে।
পরিক্রমণশীল কালস্রোতে আলোকের অলোককমলে দাঁড়িয়ে
এল না যে শরৎ তা নয়।
সমুদ্রের এ পারে ও পারে
পদ্মবন প্রফুল্ল হল কাকচক্ষু জলে ;
মর্ম্মরিত ধানক্ষেত এমনি সেখানে শিউরে উঠল সবুজে সোনায় ;
সকালবেলা শিশিরের মণিমালা গাঁথল পথের তৃণ ;
শুক্লপক্ষীয় রাতে জ্যোৎস্নাছায়ায় মায়া বুনতে লাগল চঞ্চল বেণুবন ;
শুভ্র ডানা ঝাড়া দিয়ে ডেকে উঠল হংসসারস জলতরঙ্গগম্ভীর স্বরে
রুক্ষ গিরিচূড়ায় স্ফুটকুসুম কাঠমল্লিকার আঁকাবাঁকা ডালে
লেজ-নাচানো বুল্‌বুল্ শিশ দিয়ে উঠল হঠাৎ।
কিন্তু, মানুষের আবিল দৃষ্টি, নিরুদ্ধ শ্রবণ—

ঘরে ঘরে স্তব্ধ হ'ল বুঝি অজ্ঞান শিশুর অবুঝ কলহাস্যটিও ;
জানবার সময় পেল না কেউ, কখন শরৎ এল ;
জানবেও না, কখন বিদায় নিল সে ॥

বাস্তব দুঃখের বাস্তব কাহিনী
অগ্নিঅক্ষরে শুধু লেখা যেত আজ।
জ্ব'লে পুড়ে যেত তবে কবিতার এ খাতা
মানুষের সুখ মানুষের সভ্যতা যেমন জ্বলছে আজ ॥

রাহুগ্রস্ত দিবা কামানের ধূমে সন্ত্রস্ত, রুদ্ধশ্বাস ;
থেকে থেকে রক্তিম ঝলক ; থেকে থেকে রুষ্ট গর্জন ;
ধূলি ও ধূমকুণ্ডলী ;
ছিন্নহস্ত ছিন্নপদ ভিন্নহৃদয় সৈন্যশ্রেণীর আর্ত চীৎকার।
কখনো ক্ষিপ্র আদেশ :
অশ্রান্ত গুলিবৃষ্টির মুখে
প্রচ্ছন্ন গর্ত থেকে গুহা থেকে ধাবমান বাহিনী ;
রৌরবের বিদ্যুচ্ছটা সহস্র বেয়নেটে ;
শাণিত ইস্পাতফণায় ভাই দংশন করে ভাইয়ের বুকে ;
রক্তে কর্দমাক্ত হয়ে যায় মূর্ছিত মূক মাটি
মৃত-আর-মুমূর্ষু-স্তূপাকার ভীষণ রণস্থলে।
কর্মক্লান্ত দিনাবসানে সুখ নেই সুপ্তিতেও।
আতঙ্কিত ক'রে নিশীথনীরবতা হঠাৎ বেজে ওঠে বিষাণধ্বনি।

নিমেষে আলোকমালা নেভায় সতর্ক নগরী ;
অন্ধকার ভূগর্ভে প্রবেশ করে ভীত বালকবনিতা ;
অন্ধকার শূন্যে শোনা যায় আক্রুদ্ধ গর্জন যন্ত্রদানবের ;
সর্পিল শিখায় নামে মৃত্যুগর্ভ গোলক ;
বজ্রনির্ঘোষে এসে প'ড়ে বিনষ্ট করে বিধাতৃসৃষ্ট নিষ্পাপ জীবন ;
নিমেষে বিধ্বস্ত করে মঠ মন্দির গৃহ—
জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সঞ্চয় যুগযুগান্তরের ।
উৎকর্ণ নগরীর জ্বলন্ত দৃষ্টি
অন্ধকারে সন্ধান করে প্রচ্ছন্ন শত্রুর—
বিচূর্ণ বিতাড়িত করে বজ্রগর্জিত কামানের মুখে ॥

বৈশ্যযুগের বর্বর এ সংগ্রামে
দয়া নেই, ক্ষমা নেই, বীরত্বগৌরব নেই,
আছে নির্বিচার নির্বাধ হত্যা আর হত্যা ।
আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে বারুদের ধূমান্ধকার ;
শস্যক্ষেত্র প্লাবিত ক'রে প্রজ্বলন্ত লাভাস্রোত ;
জনপূর্ণ লোকালয় শ্মশান ক'রে বিষবাষ্পের কুহেলিকা ।
তুলনা নেই মানবইতিহাসে ॥

হেমন্তলক্ষ্মীর ধান্যে ধনে এবার পূর্ণ হবে না কৃষকের গোলা ।
শীতের শান্তিবাক্যউদ্‌ঘোষণ বিফল হবে ;
বিগত পাপতাপের উপর বিস্তারিত হবে যে তুষারআস্তরণ
নিমেষে লাগবে তাতে নূতন রক্তের ছাপ ।

নন্দনের চিরআনন্দধন
মন্দারশাখাহৃত বীণাটি হাতে নিয়ে
বৎসরান্তে আসে যে একবার ধরাতলে
ব্যর্থ হবে সে বসন্ত।
আসবে না তা নয়।
লাজারুণ হয়ে উঠবে দশ দিগ্বধূ,
গ্লেসিয়ার গলবে দুর্গম গিরিশিখরে ;
নূপুরগুঞ্জিত চঞ্চলপদে সানুসোপানে নামবে নির্ঝরিণী ;
দ্বিধা ঘুচে যাবে পিক-পাপিয়ার ;
হঠাৎ এক রাত্রে চীন জাপান জুড়ে
প্লাম আর চেরীর শীতস্বপ্ন ফুঁড়ে অসংখ্য কুঁড়ি
ফুটে উঠবে শুভ্র শোভায়, অন্তরে ঈষৎ অরুণ ছোপ।
কিন্তু, চেরীফুলের সেই সহাস্য উৎসবে জাপানীরা সাজবে কি ?
ফুলের প্রফুল্ল হাসি হাসবে কোন্ মুখে ?
সুন্দরের অভিবন্দন কী লিখবে আর্ত চীন
ক্ষীয়মাণ হৃদয়রক্ত দিয়ে ?

অকাল-মেঘ দিনশেষে পুঞ্জিত হল আজ আকাশে।
তারই পানে চাই ; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবি,
অলস স্বপ্নবিলাসী আমি,
আমি কবি :
অসীম প্রকৃতিরই আশ্চর্য ভূমিকায়
যুগে যুগে বয়ে চলেছে মানবইতিহাসের প্রধাবিত ধারা ;

যখনই কোথাও ফোটে তার সৌন্দর্য বীর্য কল্যাণ বা করুণা
ঘিরে নেয় তাকে দশ দিকের স্মিত সম্মতি,
সূর্য আর সপ্তর্ষির পূত আশিস্ ঝরে তার সন্নত শিরে।
হায়, কত দুর্লভ সে সঙ্গতি!
সুলভ শুধু বিরোধ আর বঞ্চনা।
বিমুখ মানুষ বিশুষ্ক হয় তাই দিনে দিনে;
জানে না, কোথায় উদাসীন প্রকৃতি
জলে স্থলে শূন্যে বিছালো তার আনন্দটি।
ভাবি, পরিপূর্ণ ভাবে কবে মিলবে মানুষ আর প্রকৃতি।
আদিকবি বিশ্বস্রষ্টার দীর্ঘশ্বাসভরা দীর্ঘ এ প্রতীক্ষা।
দুটি তারে মিল হয়ে কবে বেজে উঠবে অপূর্ব সঙ্গীত
মানবের গৃহসীমা থেকে
দেবতার মন্দিরসীমাস্বরূপ সুনীল শূন্য পর্যন্ত!
হায়, কবে?

বোলপুর
২৭ আশ্বিন ১৩৪৪

বাউল

ইচ্ছা করে, ছুটে যাই
কৈলাসে মানসসরোবরের তীরে—
নগ্ন নিরাবরণ হয়ে দাঁড়াই অকলঙ্ক তুষারে ;
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
মেঘমন্দ্রগম্ভীর স্তবধ্বনি জাগাই সীমাশূন্য নির্জনতায়।
ইচ্ছা করে, জীর্ণবস্ত্রের মতো এ দেহ ফেলে দিয়ে
ছুটে যাই বায়ুসমুদ্রের নীলোচ্ছল তরঙ্গতাড়নে
বায়ুশূন্য আকাশে
চন্দ্র-সূর্য-তারকার-ভিড়-করা নিরন্ত পথে
কায়াহীন মায়াহীন অক্লান্তগমনে—
জানিনে কোথায়, জানিনে কেন ॥

সুদূরপিপাসু আমি,
আমি চঞ্চল—
ক্ষুদ্র অবরুদ্ধ ঘরে রব শ্রীহীন লোকালয়ে
আর কতকাল ?
হে চিরমৌন, বাজুক এবার
প্রাণের গভীরে তোমার গম্ভীর ডাক ॥

চি ত্রো ৎ প লা

হল যে অনেক দিন।
সূর্য-চন্দ্র-তারার কিরণে কিরণে ঝরেছে আকাশসম্ভব সুখ।
বিলুপ্তসীমা কিশোরস্বপ্নে জেগেছে মর্তঅমরাবতী।
পূর্ণিমার নিস্তব্ধ নিশীথে যুবক বন্ধু যেদিন
বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে জড়ালো বুকে—
হঠাৎ-জাগা ফুলের গন্ধে,
হঠাৎ-জাগা পাখির ডাকে,
দিঘির জলে দ্বিতল-বারান্দায় আর নারিকেল-সুপারির বনে বনে
ছায়াবধূ জ্যোৎস্নার ঈষৎ ঝল্‌মলানিতে
হঠাৎ এই মাটির দেহ হয়ে উঠেছিল কুসুমকুঁড়ি;
পূরেছিল মধুর মধুবিন্দুতে;
নিমেষে ফুটে উঠেছিল॥

তারপর অনেক দিন হল।
জানিনে প্রাণের নিভৃত কোনো ঘরে
পায়ের ছাপ হাতের ছাপ কারও মুছে গেল কিনা নিশ্চিহ্ন হয়ে—
ধূপের কুণ্ডলিত সুরভি ধূম জানিনে আজও জাগছে কি॥

দিনের দিন
ধূলিধূসরিত জীবনযাত্রা বৈচিত্র্যহীন, তবু
ধুলো তো ভালোবেসেছি;
ধুলোর এই পথে সবাই মিলে চলেছি।
সকাল সন্ধ্যায় শুধু

চি ত্রো ৎ প লা

শিশির-ভেজা আলে,
ভাঙা ঘাটের কোলটিতে,
একা ব'সে গান গেয়েছি আপনমনে।
সে গান শোনেনি কেউ—
সৌন্দর্যের প্রেমের বেদনার মৃদুগুঞ্জিত স্তুতি ॥

নিরবলম্ব হে মহেশ,
শূন্যের উদাস প্রান্তরে চিরদিনরাত চিরযুগ
জাগর-ধ্যানে-সমাসীন,
আজ মঞ্জুর করো আমার ছুটি।
বিনা সাধনায়, বিনা সংগ্রামে,
প্রাণের গানের শুধু অশেষ গুন্‌গুনানিতে
ক্লান্ত অবসন্ন আমি।
জেনেছি মানুষের কী গভীর ক্ষুধা,
কী গভীর খেদ ;
কী করুণ আশা
মুমূর্ষু মুখের হাসির মতো থাকে মর্মে লেগে !
সত্য ? সুখ ? ভালোবাসা ?—
কোথা গো ?— কোথায় ?

ভক্ত আর জ্ঞানী যারা
বিদ্যুৎক্ষিপ্র বিহঙ্গের মতো
চিহ্নহীন পথে ধায় কে জানে কোথায়।

মূক প্রকৃতি, কথা কইতে জানে কি ?—
বাক্যহীন শুধু ইঙ্গিত ও ইশারা
মেলে রাখে জলে স্থলে, ফুলে পাতায়,
তারায় মেঘে, শৈলশিখরে, অরণ্যে
উর্ধ্বমুখ ডালপালার আঁকুবাঁকুতে ॥

আর তো ভালো লাগে না।
হে অলক্ষ্য, হে চিরমৌন,
তুমি কথা কও এবার প্রাণে ॥

ছুটে যাই কৈলাসে মানসসরোবরের তীরে ;
নগ্ন নিরাবরণ হয়ে দাঁড়াই অনন্ত তুষারে ;
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্
তোমার স্তবমন্ত্রে জাগাই সুপ্ত দিক ;
জীর্ণ বস্ত্রের মতো এ দেহ ফেলে দিয়ে
নীলিমা হয়ে যাই নিঃসীম নীলিমাতে ॥

বোলপুর
২৯ আশ্বিন ১৩৪৪

শিল্পগুরু

শ্রীনন্দলাল বসুর

করকমলে

বাড়ি

অনন্ত নীল আকাশ শিয়রে।
ছোটো বাড়ি।
বাড়ির সমুখ দিয়ে রাঙা মাটির পথ
বেঁকে চলে গেছে বহু দূরে॥

ঘুম ভেঙে পুবের জানলায় বসলে দেখা যায়,
শালবনের উপর-আকাশে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করছে
ক্রমে নবসূর্যোদয়ের অরুণাভা লাগে শান্ত মেঘে।
নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যায়।
বনের ঘনপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে
শিশিরসিক্ত ঘাসে এসে পড়ে তির্যক্ রশ্মি॥

সন্ধ্যাকালে ঘরের দাওয়া থেকেই দেখি
একসার তালগাছের পিছনে
পশ্চিম দিক জুড়ে বর্ণের সমারোহ।
দূর থেকে দূরে মূক মাটির আহ্বান প্রসারিত।
ক্রমে সূর্য ডুবে যায়;
সাঁওতালি বাঁশির সুর নীরব হয়;
ঊর্ধ্ব আকাশে তারা ফুটে ওঠে একটির পর আর-একটি

দক্ষিণে ধানের ক্ষেত আজ
সোহাগে উছলে উঠে দিগন্ত ছুঁতে চায়।
উত্তরে অবাধ প্রান্তর
তরুবিরল, তৃণবিরল, আসক্তিহীন।
কার পানে চেয়ে দেখি ভেবে পাইনে ॥

শিশিরশোভিনী সকালবেলা যেখানে
পরশমণির পরখ করে রোজই,
থেকে থেকে হাওয়া ওঠে,
নতমুখে স্থির হয়ে ছিল যে শিষগুলি
সচঞ্চল কানাকানি করে মাঠ ব্যেপে ;
হেথা সেথা উৎফুল্ল কাশের সারি
নাচের তালে ওঠে দুলে ;
শরৎকালীন মেঘের লীলায়
ছায়ার পিছনে আলো
আলোর পিছনে ছায়া
মায়া বুলিয়ে চলে অলস দুপুরে ;
কৃষকেরা আল বাঁধে, ক্ষেত নিড়োয় ;
মেঠো গান তাদের দূর থেকে মিঠে লাগে ;
আল-পথে হাটের লোক
কোথাও হাঁটু-ভোর কোথাও কটি-অবধি
সবুজের বন্যায় ডুবে হাটে যায়, হাট থেকে ফেরে ;
শালিখ টিয়ে কলকাকলি জাগায় ;

ধানের ডগায় দোল খায় আর ক্ষুধা দূর করে টুনটুনিতে ;
দু-একটা বক ক্ষেতের উপর উপর উড়ে উড়ে
নীলাভ দিগ্‌বনানীর পটে দেখায় অতি সুন্দর ;
বিভিন্ন সীমানায়—
ইটের পাঁজার ভাঙা পাঁজর ছেয়েছে উল্লসিত লতা,
কলের চিম্‌নি ঢাকা পড়েছে গাছপালার আড়ালে,
বাঁশবন আগ্‌বাড়িয়ে চুম্বন করতে চায় কার আঁচ্‌লাটিকে,
ঝির্‌ঝির্‌ করে অশথগাছ,
প্রচ্ছন্ন কুটির থেকে ধূম ওঠে সকালে সন্ধ্যায়,
কীর্তনের সুর ওঠে, মৃদঙ্গ বাজে
শুক্লরাতের স্বপ্নাবিষ্ট প্রহরে।···
জননী অন্নপূর্ণা এখানেই
কোল মেলেছেন সন্তানের জন্যে॥

যেখানে ঐ অবাধ প্রান্তর উদাসীন,
তার রুক্ষ বুকের উপর উপবীতের মতো দেখায়
পায়ে-পায়ে-আঁকা শীর্ণ পথ ;
আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষণেও
দুঃসাহসী তৃণ সসংকোচে আসে এক ধারে ;
হেমন্তেই জ্বলে যায় ;
আলগা মাটি ক্ষ’য়ে ক্ষ’য়ে
পৃথিবীর পাঁজর যেন বেরিয়ে পড়েছে এক দিকে ;
গেরিমাটি আর কাঁকরে রচিত সারি সারি খেলার পাহাড় ;

ইতস্ততঃ ছড়ানো পোড়ামাটির চ্যাঙ্গড়—
যেন কালোমাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্মীক,
প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রামের উৎখাত অস্ত্রশস্ত্র, ভাঙা, মরচে-পড়া ;
মাটি চুঁয়ে জল জমতে জমতে
ভীরু এক-একটি ধারা বয়ে গেছে নিম্নে বালুর বিছানায় ;
তৃষিত তৃণ আর বিচিত্র বর্ণের কুসুমকণিকা
গোপনে এসে ভিড় করেছে সেই গুপ্ত তীর্থে ;
পথভোলা প্রজাপতি কখনো আসে
হলদে ডানা নেড়ে রোদের বেলায় ;
সাপ লুকিয়ে থাকে কাঁটাঝোপে, কালোমাটির ফাটলে ;
ছাইরঙের পাখি ধূসর একাকারে মিশে নিঃশব্দে ফেরে সমস্ত দিন ;
প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় টী-টী শব্দে সঙ্গিনীকে দেয় সাড়া।
এ খোয়াই ডাঙার আকাশে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের
অভ্যর্থনা নেই পিক-পাপিয়ার কলকূজনে,
কম্পিত বনপল্লবের আলোছায়াসম বিচিত্র মূর্ছনায় ;
প্রান্তরের এপার থেকে
সাঁওতাল-রমণী কখনো আসে বালু খুঁড়ে জল নিতে ;
সাঁওতাল-ছেলে কদাচিৎ যায় ওপারে তাদের ক্ষুদ্র পল্লীতে ;
প্রব্রজিত এক-একটা তালগাছ দীর্ঘ উপবাসে
কী গূঢ় সঞ্জীবনরসে জেগে থাকে তবু
ছত্রাকার পত্র মেলে ;
নিঃসঙ্গ আকাশে অপরূপ আশ্চর্য তাদের ইশারা ;
নন্দীভৃঙ্গীর মতো তারা স্তব্ধ, তারা তন্দ্রাহীন।…

চিত্রোৎপলা

এখানে এই রিক্ত প্রান্তরের বুকে
সন্ন্যাসী শিবের যোগের আসন ॥

এইখানে
দিনযামিনীর উদয়াস্ত যেখানে সহজ,
হরগৌরীর মিলন যেখানে সম্পূর্ণ,
অবারিত দিগ্‌বলয়ের কেন্দ্রস্থলে ছোট্টো বাড়ি।
বাস করেন ভক্ত নন্দলাল,
রূপরাগের কবি,
চিত্রকর ॥

বোলপুর
২০ আশ্বিন ১৩৪২

রূপরাগ

চোখ দিয়ে শুনি
দিবানিশি আলোছায়ার চঞ্চল চরণপাতে
বিশ্ববীণায় রূপ-সমস্ত যে বিচিত্র রাগে বাজছে।...
সেই রাগিণী আমার কণ্ঠে কি বাজবে না আমার গানে ?

শরতের শেষে আজ দেখি, আপাণ্ডুর আকাশ থেকে
প্রভাতের হেমধারায় ভেসে যাচ্ছে
নবমুঞ্জরিত ধানক্ষেতের দূরপ্রসারিত শোভা ;
দিগন্তে বনচ্ছবি আর বনের গাঢ়ছায়াশ্রিত পল্লী
বাষ্পআভাসে ম্লান হয়ে কত দূরেই না গিয়েছে
অস্তিত্বের অন্য পারে—
চেনা নামে, পুরোনো পরিচয়ে আর বুঝি ছোঁওয়া যায় না
কী করে প্রকাশ করি আমার বিস্ময়, আমার সুখ ?

ধানের মঞ্জরী সলজ্জ শিহরণে,
অশ্বত্থের পুঞ্জপল্লব অশ্রান্ত মর্মরে,
অবিরত ইষ্টনাম জপ করে যেমন—
আমি তা পারিনে।
জানি, কী বুক ভ'রে আকাশকে পায়
ঐ যে শঙ্খচিল মেঘে মিলিয়ে এল—
আমার তো পাখা নেই॥

বোলপুর
২১ আশ্বিন ১৩৪২

নিরুদ্দেশ কামনা

সন্ধ্যার অন্ধকারে
পুষ্পিত শালবনের সঙ্কীর্ণপথে একা একা যাই
মনে মনে বলি :
কোথা সে প্রেয়সী
এ জীবনে যার আবির্ভাব অবধারিত ছিল ;
সন্ধ্যাতারা উঠেছে বহুক্ষণ হল,
প্রাণ আমার তৃষিত রয়েছে চিরজীবন
অশ্রুলবণাক্ত চুম্বন তার কামনা ক'রে।
হায় রে কল্পিতা প্রেয়সী !

একা জেগে উঠি
ঘনঘোরা যামিনীর অশ্রান্ত ঝর্ঝরে।
সূচিভেদ্য অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে খুঁজি :
কোথা সে ভগবান
শীতল যাঁর দুটি চরণের স্পর্শ চাই চিরজীবন
তপ্ত বুকের ভিতর—
একটু স্পর্শ চাই।
হায় গো কল্পিত ভগবান !

বোলপুর
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

দুরাশা

মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে মন,
দেখতে চায় না প্রভাতসন্ধ্যার জ্যোতিরুৎসব-
বর্ণবিলাস।
বলে, পুনরাগত বসন্তে
শালবনের শিরে শিরে পুষ্পজোয়ার
ভেঙে পড়ে যদি পড়ুক ভেঙে ;
দুর্লভ পূর্ণিমায় বাণীর বন্যা
প্লাবিত ক'রে থাকে নিখিল ভাষা
করুক্-না ;
চাই না ভাষা, চাই না গীত, চাই না শোভা,
চাই না গন্ধ—
চাই না কিছু ॥

চাও না কিছু ?

আমি চাই স্পর্শ, আমি চাই সঙ্গ,
আমি চাই সংঘাত ॥

হায়, মূঢ়, হায়!

নয়নে দৃষ্টি, শ্রুতিতে ঝঙ্কার, সুদূর গন্ধ
জানে না কোন্ মহাদেবতার পরম প্রসাদ—
নয়নে দৃষ্টি, শ্রুতিতে ঝঙ্কার।
কী করে বোঝাই, বলো, ছোঁওয়া যায় না সন্ধ্যাতারা,
ধরা যায় না বেণুকুহরস্রুত সুরলহরী।
তবু কী সুন্দর সে দীপ্তি, গভীর সে সুর—
জীবন-জীবনান্তর তারই অনুসরণে
ভুলে যাই ছুঁয়েছি কিনা পদতলে ধরণী,
লগ্ন ছিনু কিনা জননীর বুকে।
বারণ তো করে না গোলাপের কাঁটা,
বারণ করে তার স্বপ্নশোভা—
হেসে হেসে করতলের গোলাপ
কেড়ে নিয়ে যায় অসীম দূরে।
স্পর্শবিলাস সাজে অন্ধে।
অন্ধ হতে চায় মন সাধ করে।
চায় সে স্পর্শ, চায় সে সঙ্গ, চায় সে আলিঙ্গন—
লীন হতে চায়, লুপ্ত হতে চায়,
অনন্য এক হতে চায় অনুরাগে।

হায়, কী দুরাশা!

বোলপুর
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

দুই তার

সরু মোটা দুটি তার আছে জীবনবীণায়।
ছুঁয়ে যায় শুধু সরু তারে গুণীর ছড়,
মোটা:তার সাড়া দেয়
সমবেদনা-ভরা অনুরণনে ;
নইলে বাজে না সুর ॥

মোটা তার, যে নামে যে রূপে
পরিচয় আমার সংসারের হাটে হাটে—
দুঃখে যে দীন,
সুখে যে গরবী,
দণ্ডে পলে অপহৃতআয়ু
ক্লিষ্ট যার তনু
উদ্‌ভ্রান্ত মন,
লোকের মুখে মুখে ফুৎকারে ফুৎকারে
উড়ে বেড়ায় রঙিন বুদ্‌বুদের মতো—
ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন বুঝি টুটে যায়
শূন্য মৃত্যুতে ॥

চি ত্রো ৎ প লা

সরু তার চোখেও দেখিনে,
হাতেও ছুঁইনে,
কোথাও খুঁজে পাইনে নাম কি পরিচয়,
জন্মে বা মরণে আমার আশা বা শঙ্কা নেই তার—
আদি বা অন্ত নয়।
বীর্যে বাজে সে তার,
বাজে করুণায়,
সৌন্দর্যে বাজে আর বাজে প্রণয়ে
পঞ্চমে উচ্চকিত ॥

সরু তার বাজে,
মোটা তার সাড়া দেয় সমবেদনা-ভরা অনুরণনে-
নইলে বাজে না গান ॥

সরু তার ছিঁড়ে যায় যদি
কোথা ছুঁয়ে যাবে এ জীবন গুণীর ছড় ?
মোটা তার সাড়া না দিলে মোহে বা অভিমানে
মৌনপারাবার পেরিয়ে শেষে
কূলে তো ভিড়বে না সুরলোকের অতিথি।

বোলপুর
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

প্রদোষে

দিবসের উত্তাল কলরবে মনে আনিনে প্রদোষের শান্তি—
তাই তো সম্ভব হয় হাজারের সঙ্গে
হাজার-এক হয়ে ভিড় বাড়ানো,
অযুত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
নিজের কণ্ঠে নিজের জয়ঘোষণা।
তাই তো সম্ভব হয় জড়ের দাসত্ব একমুষ্টি অন্নের প্রয়োজনে।
সম্ভব হয় অতীতের স্মৃতিতে অশ্রুমোচন,
ভবিষ্যতের আশায় সোনার স্বপ্নপ্রতিমা গড়া।
কবির সম্ভব হয় কবিতা, গান ;
শিল্পীর সম্ভব হয় মূর্তি, চিত্র।
মিলনে সম্ভব হয় চুম্বন, আশ্লেষ ;
বিরহে সম্ভব হয় তাজমহল॥

মহাভাগ্যবান্ তারা, জন্মান্ধ তাই বিটপিলতা ;
গুণীর সুর-বাঁধা বীণাযন্ত্রের মতো শান্ত তাদের প্রতীক্ষা,
আনন্দিত তাদের সাড়া।
মহাভাগ্যবান্ তারা, প্রায়ান্ধ তাই বনের পশু, স্রোতের মীন ;
ঊর্ধ্বে চেয়ে দেখে না সীমাহীন মহাকাশ।

চি ত্রো ৎ প লা

মহাভাগ্যবান্ তারা, পক্ষশালী বিহঙ্গম
মুক্তি পেয়ে তাই নীল অম্বরে
উষাসন্ধ্যার দুয়ারে মেলেছে গীতকাকলি,
পালখে এঁকেছে আলোকসুষমা,
স্বপ্নজাল ছিন্ন ক'রে তবু নিভৃত কোটরে
ঘটেনি কোনোদিন লোকেশ্বরী যামিনীর অলোক আবির্ভাব ॥

বাসনায় বদ্ধ ও অন্ধ মানুষ, এষণায় মুক্ত ও চক্ষুষ্মান্—
কে তারে বিদ্রূপ করল মুক্তি দিয়ে ?
কে তারে পরিহাস করল অলীক বন্ধনে ?
ভাবি তাই ঊর্ধ্বে তারকিত শূন্যে
দৃষ্টিদূত প্রেরণ ক'রে ।
দৃষ্টি হার মানে ।
কল্পনাপক্ষ প্রসারিত ক'রে ।
কল্পনা হার মানে ।
সত্তা নিমগ্ন হয়ে যায় সত্তাসাগরে ;
ফিরে জাগে না কোনো তরঙ্গ,
ভাসে না কোনো বুদ্‌বুদ,
আসে না কোনো সাড়া—
উদয় থেকে অস্তে যায় অনন্তকোটি নির্বাক্ নক্ষত্র
ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ ক'রে ।
জানি, সেও মায়া ।
কী অদ্ভুত মায়া ॥

বোবা ভাষার এই অন্ধ আকুতি !
ভাষায় আছে কি সেই প্রকাশ
যা আছে সূর্যালোকে,
নক্ষত্রস্বচ্ছ অন্ধকারে,
যা আছে মাতৃমুখে প্রসন্ন হাসিতে,
শিশিরেও আছে যা ঝলোমলো সুখে,
ধুলাতেও আছে যা অসীম নির্ভরে।
মানুষের মুখের ভাষায় নেই নেই ॥

স্তম্ভিত বন-পানে চাই,
চাই ছায়ামূর্তি তালতরুশ্রেণীর দিকে ;
ভাবি, কোনো সত্য কবিতা কোনোদিন লেখা হয়নি।
সুর দু-একটি জেগেছে বটে,
সুখের সে সার, সৃষ্টির সে পূর্বগ—
ভাষা তবু জোটে নি, রূপ তবু ফোটে নি,
গড়ে ওঠেনি জীবনপ্রতিমা।
সুর-সুরধুনীর উজান স্রোত বেয়ে
গেছে বটে ক্ষণজন্মা মানুষ ত্রিলোকের ঘাটে ঘাটে—
চন্দ্রোদ্ভাসিত শিবের জটাজালগহনে ;
বেদগানপ্রতিবোধিত ব্রহ্মার কমণ্ডলুতলে ;
লক্ষ্মীসেবিত বিষ্ণুর ভাস্বর শ্রীচরণে ;
গেছে সে চিররহস্যে-গূঢ় স্রষ্টার সন্নিধানে,
নির্বাক্‌, নিশ্চিন্ত, বিশ্বচেতন—

মানুষ হয়ে ফেরেনি সে মানুষ, হয়নি স্রষ্টা ॥

স্তম্ভিত বন-পানে চাই,
চাই ছায়ামূর্তি তালতরুশ্রেণীর দিকে।
এই মুহূর্তে সুপ্তসংসার জাগ্রত পৃথিবীতে
যে চেতনা আন্দোলিত
অম্বুধির বেলায় বেলায় উন্মত্ত তাণ্ডবে অতলস্পর্শ গানে,
যে চেতনা ধাবিত
গঙ্গা-গোদাবরী-সিন্ধু-শতদ্রুর নিরন্তর প্রবাহে,
যে চেতনা সঞ্চারিত
সহস্রশীর্ষ অরণ্যের শতসহস্র শিকড় বেয়ে শতসহস্র শাখায়,
যে চেতনা ঊর্ধ্বাভিসারী
বিন্ধ্যহিমাচলের অনন্ত শৈলশ্রেণীতে অগণ্য চূড়ায়,
সে চেতনা ধুলাকে এক করেছে ধ্রুবনক্ষত্রের সঙ্গে—
সে চেতনাই জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
মহান্তপুরুষের চিরজাগরণ—
ভাষার অতীত, ভাবের অতীত,
বাক্যমনের চিরবিস্ময় ॥

বোলপুর
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

বিচ্ছেদ

মাঝে মাঝে মনে হয়—
জনশূন্য পৃথিবীর অনন্তপ্রসার বুকের উপর দিয়ে
জীবন-জীবনান্তর হেঁটে পৌঁছুলেম
অভিনব জনশূন্যতায় ॥

২

নামহীন আঁকাবাঁকা নদী
স্তিমিত ধারায় ব'য়ে ব'য়ে দূরে মিলিয়ে গেছে
শাল-সরল-অর্জুনের ভিড়-করা অন্ধকারে
নিঃশব্দ দিনান্তের ঈষৎ ঝিকিমিকি আভা
ললাটে এঁকে নিয়ে—
নিকষে স্বর্ণরেখা যেন।
শরবনে শৃগালের ডাক বারেক উঠে থেমে গেল,
আকাশের নীলকান্ত থালায় প্রথমোদিত তারা
সকরুণ অশ্রুবিন্দু যেন দেবতার।…
এখানেই ছিল, হায়, রামরাজত্ব।
এই সে সরযূ, ঐ সে তপোবন,
বিলুপ্ত শতাব্দের স্মরণে পরিম্লান ;
যেন এ জীবন বিভগ্ন রাজপ্রাসাদের
ধূলিসঞ্চিত কোণে ব'সে জীর্ণ পঞ্জরতলে মৃত আশা-পোষণ ;
অন্ধকারে পাখা ঝাপ্‌টে ফেরে বোবা চাম্‌চিকে ॥

৩

অখ্যাত গ্রামের পথ
ধূসর ধুলাস্তৃত দেহে
প্রদীপজ্বালা শিমুল পলাশ, সুপ্তিমগ্ন পরিবার,
পোড়ো ভিটে, ফণীমনসার জঙ্গল,
অশ্বত্থ বট, শূন্য ক্ষেত্র, বারিপূর্ণ দিঘি,
শালবন, তালবন, সাঁওতালকুটীর,
সব পার হয়ে গেছে রুক্ষ ডাঙায়
বালুকঙ্করের তরঙ্গিত ভূমিতে
রৌদ্রঢালা আকাশ যেখানে উপুড় হয়ে পড়েছে
চৈত্রশেষের নিঝুম দ্বিপ্রহরে।
বিশ্বভুবনের ঈশ্বর
সঙ্গহীন একা বসে আছেন বিশ্বভুবনকেন্দ্রে
অসীম শোভায় মগ্ন, অসহ্য উজ্জ্বলতায় লীন,
নিস্তব্ধ, নির্নিমেষ—
সে শোভার, সে সৃষ্টির
দ্বিতীয় দ্রষ্টা নেই কোনো॥

৪

দীর্ঘ দিনের পারে অপরিচিত অতিথিশালায়
কম্পিতশিখা প্রদীপ জ্বলছে নিভৃত কোণে ;
অপরিচিত সঙ্গীরা নিদ্রাগত ;

গভীর অরণ্যে থেকে থেকে পেচকের কাকুতিতে
নিঃশব্দতা মনে হয় নিঃশব্দতর।
এই মুহূর্তে বিভু ও কাঙাল সংসারের যিনি স্রষ্টা,
তরুণতরুণীর গাঢ় আলিঙ্গনের অন্তরেও
সে বিরহ তাঁর ঘুচল না,
মাতাতনয়ের পুলকিত চুম্বনের স্পর্শেও
সে ভুখা তাঁর মিটল না,
যে বিরহ আর যে ভুখা তাঁর সৃষ্টির পূর্ব থেকে॥

৫

অসীম শোভার এই সৃষ্টিতে
নিঃসঙ্গ মানুষ। নিঃসঙ্গ ভগবান॥

বোলপুর
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

পথ

নুড়িবিকীর্ণ পথে নৃত্যচঞ্চলা গিরিনদী ;
শালপলাশের বনে গোমহিষের গলঘণ্টারব ;
আচম্‌কা বৃষ্টি, আচম্‌কা রৌদ্র ;
কৃষককুটীরের কূল পর্যন্ত তরঙ্গিত
নবীন ধানের উৎফুল্ল শোভা ;
দিগন্তে বৃক্ষপুঞ্জিত তিনপাহাড়িয়া, আনীল, ধূসর ;
বটতলায় শ্রান্ত পথিক ;
হাটের যাত্রী সাঁওতাল-রমণীদের সম্মিলিত সুর,
উচ্ছলিত হাসি ;
ভিজে বনে উড়ন্ত নীলকণ্ঠ পাখিদুটি ;
ভিজে ঘাসে স্খলিত কৃষ্ণচূড়া—
একে একে পার হয়ে এলেম
অপরিচিত গ্রামোপান্তে অচেনা এই চটিতে,
কয়েকটি প্রাচীন শিরীষে যেখানে প্রচুর ছায়া বিছানো,
আঙিনায় কামিনীবৃক্ষ ফুলে ভরা,
সারাবেলা রৌদ্রস্পন্দন ঐ মর্মরিত অশ্বত্থের পাতায় পাতায়।
কূপের স্ফটিকস্বচ্ছ জল স্বাদু, শীতল ;
অশিক্ষিত গ্রামবাসীর সরল আলাপ, সুমিষ্ট হাসি।
ইচ্ছা হয়, এইখানে থেকে যাই অবশিষ্ট জীবন ॥

হায়, নিরর্থক ইচ্ছা ॥

অশ্বত্থশিরীষের পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে
করুণ রঙে ঝরে বিকালের আলো ;
ছেড়ে যেতে হয় নয়নাভিরাম দৃশ্য,
প্রাণাভিরাম বন্ধুতা,
বনের প্রান্তে, পাহাড়ের পাদমূলে, অখ্যাত স্থানে
পরিচয় ঘটল যার আজই প্রথম
আজই শেষ ॥

নতোন্নত প্রান্তরের বুক দিয়ে,
কাননের কটি বেষ্টন ক'রে,
ময়ূরাক্ষী পার হয়ে, অজয় পার হয়ে,
গেরুয়া ধূসর পথ
আমায় নিয়ে চলেছে আমার লক্ষ্যে,
তোমায় নিয়ে চলেছে তোমার লক্ষ্যে—
নিজের লক্ষ্য তার কোন্ দূরে
কোন্ দেশে ?

বোলপুর
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

পথে পথে

সেটুকুই ধন্য হয়েছে এ জীবন
যেটুকু কাটল পথে পথে—
আশ্বিনে নবশস্যশ্যামল মাঠের মাঝখানে,
বৈশাখে রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে পর্বতে,
ফাল্গুনে শালপলাশের পুষ্পিত গহনে,
আষাঢ়ে মুষলধারা মাথায় ক'রে খেয়াহীন নদীর ঘাটে।
যে পথের এ ধারে ও ধারে
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত,
শুকতারার হাসি আর সন্ধ্যাতারার আশিস্,
পাখির কাকলি আর জলের কলস্বর আর ফুলের গন্ধ।
যে পথ বারে বারে
অপরিচিতকে করেছে পরিচিত,
পরিচিতকে করেছে প্রিয়,
চিরসৌন্দর্যের মুখের উপর থেকে
উন্মোচন করেছে অভ্যাসের অন্ধ আবরণ।
যে পথে আমার
চিন্তা নেই, চেষ্টা নেই,
বাসনা নেই, ক্ষোভ নেই,
সুখ বা দুঃখ নেই,
আশা বা অনুশোচনা নেই কোনো—

চি ত্রো ৎ প লা

মুক্ত আমি, আনন্দিত আমি,
অনাম অনিকেত আমি
প্রবাহিত হয়ে চলেছি
আলোর সঙ্গে হাওয়ার সঙ্গে
ষড়্‌ঋতুর গন্ধগান-রূপরাগের মায়ার সঙ্গে
অনন্ত নীলাকাশের এক দেশ থেকে আর-এক দেশে

সেটুকুই ধন্য হল এ জীবন
যেটুকু কাটল পথে পথে।
ঘরের ভিতরে ক্ষুদ্র আমি, রুদ্ধ আমি,
নামে-রূপে দোষে-গুণে নির্দিষ্ট আমি,
আজন্ম মরণভীরু আর
আমরণ বাসনাবিক্ষুব্ধ :
এ আমি নয় কবি,
এ আমি নয় পথিক,
এ আমি নয় অমর অদেহ আত্মা॥

বোলপুর
১৯ মাঘ ১৩৪৩

স্বপ্নচমৎকার

বারে বারে চমক লেগেছে চমৎকৃত প্রাণে
নয়নবাতায়নে এসে বলেছে যখন, মরি ! মরি !
কখনো তো দেখিনি এ জগৎ !··· অথচ,
এই পথ দিয়ে গেছি সকালে সন্ধ্যায় ;
এই কোকিল ডেকেছে এই চূতশাখায় ;
ধুলায় মিশেছে এই পুষ্পপরাগ অলক্ষ্যে ঝ'রে ঝ'রে ।
কখনো তো দেখিনি এ জগৎ !

এমন প্রভাত হয়েছে এমন নদীকূলে ;
এমন চাঁদ উঠেছে এমন নির্মল নীলিমাতে ;
বালুবেলায় এই নীরধারা
অস্ফুট কলস্বরে বয়ে গেছে যুগ যুগ,
রাত-জাগা দখিনা বাতাসে এই নারিকেল-বন
স্বপ্নে কথা কয়েছে ।
তবুও দেখিনি এ জগৎ ॥

বুঝি বা ঘুমিয়ে আছি সারাজীবন ।
বুঝি আমার জাগতে জাগতে
জাগা আজও হয়নি ।

চি ত্রো ৎ প লা

ঐ নারিকেল-গাছের মতো স্বপ্নে কথা কয়েছি
নিঝুম নির্জন রাতে ;
দেখিনি তারা, দেখিনি চাঁদ,
দেখিনি সূর্য,
সাগরগামিনী গঙ্গার ধারায় ধারায়
দেখিনি কেমন কাঁপে আমার ছায়াখানি
সোনা-ঢালা তুপুরবেলায় ॥

সুপ্তির 'পর সুপ্তি,
স্বপ্নকে ঘিরে স্বপ্ন ।
কবে হবে জাগরণ ?
কবে দেখব একটি ঘাস, একটু ধুলো ?

বোলপুর
২০ মাঘ ১৩৪৩

জাদু

ফুলের গন্ধে, আকাশের আলোয়,
পরিচিত কণ্ঠস্বরে, অপরিচিত হাসিতে,
শত জনে শত দিক থেকে হাতছানি দিয়ে
দিশেহারা করে আমার প্রাণ।
যত ওদের বলি,
আমি বড়ো দুঃখী, নিঃসঙ্গ,
আমি বড়ো ভাষাহীন, সুরহীন,
বিদায়পথের আমি পথিক,
আমায় আর কেন ডাকো—
ওরা শোনে না ; ওরা বোঝে না ;
ওরা কী জাদু ক'রে আমায়
মনে মনে এই মন্ত্র জপায়,
'ভালোবাসি, বড়ো ভালোবাসি !'
অর্থ কী তার কিছুই বুঝিনে।

বোলপুর
৩০ মাঘ ১৩৪৩

চঞ্চল

অলক্ষ্য চরণের স্পর্শসৌভাগ্য-ভিখারি,
চকিত চঞ্চল সেই স্পর্শেরই পিছনে পিছনে
ফুটে উঠছে রূপের কমল ও কমলবন
আকাশে, আলোয়,
অনন্ত দেশে ঐ, অনন্ত কালে।
ফুটে উঠছে জীবন ; ফুটে উঠছে কল্পনা ;
ফুটে উঠছে ভাব ; ফুটে উঠছে অনুভব ॥

নিমেষ-পরে চলে যায় চিরচঞ্চল চরণ ;
চলে যায় স্বপ্ন ; চলে যায় স্মৃতি ;
ঝ'রে পড়ে পাপড়ি ; মুদে যায় ফুল ;
মৃণাল-সমেত ডুবে যায় অতলজলে ॥

নিজের জীবনে আর নিখিল জীবনে
ক্ষণকাল দেখো, কবি, দেখো এই শোভা ;
ভোগ করো এই কৌতুক ;
মিশে যেয়ো তারপর
নিঃসীম নিলীমাতে।

বোলপুর
৪ ফাল্গুন ১৩৪৩

বসন্তে

নীল শূন্য থেকে বসন্তের বন্যা এল আবার,
আঘাত করল অদৃশ্য তরঙ্গে তরঙ্গে শীতসুপ্ত ধূলিরে !
নিমেষে জেগে উঠল ধরণী
প্রান্তরে, পর্বতে, অরণ্যে, নদীকূলে ;
চিরন্তনী নিজের বয়স ভুলে
উন্মাদিনী হয়ে উঠল অনন্ত সৌন্দর্যে ॥

জেগে দেখলেম কুয়াশামুক্ত মাঘের এক প্রভাতে,
দিগন্তে পলাশ-শিমুলের রিক্ত শাখায়
অরুণরাগে জ্বলে উঠল পুষ্পদীপালি ;
সেদিন সুপ্ত আম্রবনের অঞ্জনপটে
ঝল্‌মল্‌ করে উঠল আলোকে হাওয়ায়
জামগাছগুলির নবীন সবুজ ।
ক্রমে শালবনে পীত লোহিত বাদামি পাতার
বিদায়সমারোহের অন্তরে অন্তরে
সূক্ষ্ম সুবাস ঝরালো প্রচ্ছন্ন নবীন ;
মধুমালতীর কচি ডালগুলিতে কচি পাতা
যেন কথা কয়ে উঠল আধো-আধো স্বরে ;
নেবুফুলের মধুমুগ্ধ মৌমাছি
গুঞ্জনে ভ'রে দিল আতপ্ত বেলা ।
কী হতে কী হল দিকে দিকে !

চি ত্রো ৎ প লা

কোকিল ডেকে উঠল কুহুস্বরে ;
বেনেবউ এল অতসীবরন ডানা মেলে ;
দৈনন্দিন আনাগোনার অনবসরে সকালে সন্ধ্যায়
মন ভোলালো আম্রবনের আতাম্র সাজ ;
কখনো তারই নবমুকুলের আকুল গন্ধে
থমকে দাঁড়ালেম পথের মাঝখানে ।
ক্রমে এল যখন মাধবী, এল বকুল,
শালের ফুলে আর মহানিমের ফুলে
দক্ষিণের হাওয়ায় হাওয়ায় চলল উত্তর-প্রত্যুত্তর,
হাসি উঠল হাটের মাঝখানে,
বাঁশি বাজল গোচারণের মাঠে—
শুক্লরাতের সুধাধৌত প্রহরে
আপনি জাগল বুকের ভিতর বেহাগের তান ।
দিনরাত্রির যখন চেয়ে দেখি যে দিকে
মুগ্ধ মন বলে, মরি ! মরি !
এত বর্ণ, এত গন্ধ,
এমন নীলিমা, এমন আলো,
পাপিয়ার ঝঙ্কার, কপোতের কূজন,
গহন পল্লবে খদ্যোতের ঝিকিমিকি,
এত সুখ, এও কি সম্ভব ॥

সকলই সম্ভব, যখনই
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর,

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
ইন্দ্রিয়ে ধরে না, মনেও ধরে না লক্ষের একাংশ,
যে অসীম সুখে যে অনন্ত সৌন্দর্যে
আজ জেগে উঠল বসুধা নবীন বসন্তে।

বোলপুর
২৬ ফাল্গুন ১৩৪৩

মরীচিকা

চেয়ো না, চেয়ো না আর,
এই পথ দিয়ে যেতে পথের দু ধারে
ব্যাকুল এ বনানীর বসন্তশোভা-পানে
চেয়ো না তুমি ॥

অপারের পারে এসে
ফিরে ফিরে কেন ফিরে যাবে
বুকে নিয়ে অব্যক্ত ভালোবাসা,
অগীত সঙ্গীত,
অশেষ তৃষা ?
জপ ক'রে কী হবে
চূত-বকুল-শাল-শিরীষের মধুর নামগুলি ?
প্রভাতসন্ধ্যার স্বর্ণকিরণ
গাঁথা যাবে না গলার হারে ।
পূর্ণিমানিশীথিনীর ভুবনপ্লাবিনী সুধা
অঞ্জলি ভ'রে সেচন করা তো হবে না
নবঅঙ্কুরিত আশার মূলে ।
পাপিয়ার গীত
সুরের মরীচিকা আঁকবে স্বপ্নের ভূমিকায় ।
অধরস্থিত প্রিয়ার অধর
মিলাবে অনন্ত দূরে ॥

তাই বলি চেয়ো না, চেয়ো না তুমি
এই পথ দিয়ে যেতে পথের দু ধারে।
বসন্তের কাননে কাননে
আপনারই নাভির গন্ধে বিমুগ্ধ মৃগের মতো
ফিরো না, ফিরো না, বন্ধু,
দক্ষিণের হাওয়ায় হাওয়ায়
অব্যক্ত সৌরভে আর করুণ মর্মরে
চঞ্চল চকিত হয়ে॥

বোলপুর
১২ চৈত্র ১৩৪৩

স্বপ্ন

স্বপ্নে দেখলেম সে এসেছে।
সে এসেছে
জাগরণে যে আসেনি,
যে আসবে না কোনোদিন ॥

ডানহাতের চঞ্চল চুড়ি ক'গাছি
মৃদু কানাকানি ক'রে বুঝি বলছিল :
কী ছলে প্রবেশ করবে, ভীরু ?
আপন ঘরে তুমি প্রবেশ করবে কি ?

দুটি হাতে দুটি হাত বন্দী ক'রে
ঘরে আনলেম তোমায় দুয়োর পেরিয়ে ;
মনে মনে বললেম : ওগো,
দুয়োরের ঐ চৌকাটটুকু
হিমাচলের মতো কেন দুর্লঙ্ঘ্য ?
মুখ ফুটে বললেম : বন্ধু !
বললেম না : ওগো তুমি,
চোরের মতো ভীতু
নিশুত-রাতে-উদিত কৃষ্ণনবমীর চন্দ্রিকা,
শীতের শালবনে তালবনে

ছায়াসহচরী হয়ে নীরবে ছিলে দাঁড়িয়ে—
জানতে যে পারিনি ;
দুয়োর খুলে দিয়েছি, এসো এখন ঘরে,
ভয় কোরো না,
এসো আমার শুভ্র বিছানায়,
এসো আমার বুকে ॥

স্বপ্নে দেখলেম, সে এসেছে
জাগরণলোকে যে আসেনি,
যে আসবে না কোনোদিন।
ঘুমে-জড়ানো দু চোখ মুছে মুছে
বুঝেও বুঝতে পারিনে ভালো :
হায়, সে নষ্ট স্বপ্ন,
ভ্রষ্ট চন্দ্রিকা,
ভোরের দিকে জাগা শেষ-শিউলির বাস,
শুকতারার হাসি—
অন্য কিছু নয়—
নয়।

বোলপুর
৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

নির্বেদ

দেখেছি আকাশ নীল,
গাছপালা সবুজ,
কুৎসিত রমণী
সেও যখন সোহাগ করে কোলের শিশুকে
কৃষ্ণজননী যশোদার আশ্চর্য উদ্ভাস ঘটে
চক্ষে মুখে অকস্মাৎ।
শুনেছি কান পেতে
বৃষ্টির ঝর্ ঝর্;
বায়ুর সর্ সর্,
পিক-পাপিয়ার ডাকাডাকি॥

সম্বল বলতে এই।
তাই নিয়ে লিখেছি আর
লিখতেই হবে কবিতা।
অর্থ নেই, আবশ্যকতা নেই,
তবুও লিখতে হবে॥

শেলি, কীট্‌স্, কালিদাস,
সাদি, হাফেজ, লিপো,
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ,

জগতের এই সব শ্রেষ্ঠ কবিরা,
যুগ-যুগের স্রষ্টা আর সাক্ষীরা
মুক্তপক্ষ মন নিয়ে
ভাবের কল্পনার যে আকাশ ছুঁয়ে এসেছে বারম্বার
অনায়াসে,
সে আকাশে সঞ্চার নেই আমার ;
কোনোদিনই নেই।
উচ্চিংড়েজাতীয় জীব
দিনের বেলায় হয়তো উড়ি
ঘাসের উপর-উপর কিছুদূর,
রাতের বেলায় একঘেয়ে ঝিল্লিধ্বনিতে
আপনাকে বিজ্ঞাপিত করি আপনার
প্রচ্ছন্ন গর্ত থেকে।
দ্বিজ নই, বিহঙ্গ নই ॥

রোদে-পোড়া মাটির
বিজন প্রান্তরে শুয়ে ভাবি,
এ দুর্বুদ্ধি কেন ?
সন্ধ্যা ঘনায় প্রদোষে ;
ঝামর-চুলো সন্ন্যাসীর মতো
এখানে সেখানে ছন্নছাড়া তালগাছের
মাথায় মাথায় হাওয়ার বকুনি।
ভাবি,—

এ বিপরীত বুদ্ধি কেন ?
একটা লোক
যার ছিল একটা নাম আর পরিচয়,
ছিল বাপ-দাদা বাড়ি-ঘর,
বিদ্যাসাধ্য বা তারই বিশেষ অসদ্ভাব,
আমার এ জীবনটায়
তাকে বেদখল করব ব'লেই
হয়তো খাড়া করেছি এই আর-একটা লোককে
যে কবি। তথাকথিত কবি।

স পাপিষ্ঠস্ততোধিকঃ।
চোখকানের আনাচে-কানাচে
ঘটল কি না ঘটল কিছু,
অমনি কলম বাগিয়ে রুখে উঠেছে লোকটা—
কবিতা লিখবে॥

কবিতা লিখবে ?
কেন, বাপু ?
আঙুলের ডগা চুলকোয়
না দাঁতের ব্যথাটা ভুলতে চাও ?
দুয়েরই তো ডাক্তারি ওষুধ থাকতে পারে।
খামোকা কাগজের উপর কালির আঁচড় টেনো না।
'টেনো না' বলতে বলতেই

লোকটা ঠিক আঁচড় টেনে চলেছে,
এই এক তামাসা ॥

ভাবি,
যে লোকের নাম ধাম পরিচয় আছে,
সিন্দুক ঢুঁড়লে কোন্-না বেরোয় কুষ্ঠিঠিকুজি,
আমার কাজ নেই তাকে ;
যে কবি তাকে নিয়েই বা কী হবে !
[হ'ত যদি সত্যকারের কবি !]
[কী হ'ত তাহলে ?
শেষ পর্যন্তই যদি ভেবে দেখ,
শেলি কীট্‌স্ বা রবীন্দ্রনাথ হয়েও
কোনোই সার্থকতা নেই ।
শেষ সার্থকতা নেই,
ব্র্যাকেটের ঘোমটার মধ্যে
সত্যবাদিনী বধূর সঙ্কুচিত উক্তির মতো
এরও উল্লেখ থাক্ ।]
সে আমি কোথায় আমার
তালগাছ-বকানো হু-হু-হাওয়া
হঠাৎ যার গায়ে মাথায়
নিঃশব্দে হাত বুলোল একবার কাছে এসে ।
[ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেলেম না ।
বললেম মিছে কবিত্ব ক'রে,

হাওয়া যেন হাত বুলোল গায়ে।]
সে আমি কোথায়
যে থাকে বাকি জাগরণের শেষে,
স্বপ্নের শেষে,
অমাবস্যাঘন ঘুমের ভিতর,
সূচিভেদ্য অন্ধকারে।
না থাক্ দেহ, না থাক্ মন,
যে তাই
ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে সার্থক,
হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে খুশী,
আছে আর নেই হয়ে
হাঁ আর না দু দিকেই ঘাড় নাড়ে।
সে আমি কোথায়?

হায় কবি,
হায় কবির-মুখোষ-পরা দার্শনিক,
তোমায় কে ডেকেছিল?—
যাও, যাও এ জীবন থেকে!

বোলপুর
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

সান্ত্বনা

মুখ ভার কোরো না, বন্ধু !
চোখের জল ফেলো না।
কতক্ষণ বসে আছ এমন
বিছানাতে জেগে ?
আমার যে ঘুম ভাঙেনি ;
নইলে এই চোখের জল
কাপড়ের খুঁট দিয়ে
মুছে নিতেম অনেক আগে,
দু চোখে দুটি চুমো দিয়ে
আবার ঘুম পাড়াতেম আমার বাহু ঘিরে ॥

তুমি আমার, আমি তোমার।
কখনো বকিঝকি ;
রাগ করতে হয় তাই ব'লে ?
আদর করিনে কখনো ?
আবদার শুনিনে ?

তুমি এসে এই বুকে বাসা নিয়েছ ব'লেই তো
সর্বক্ষণ হা-হা করে না ফুটো পাঁজরগুলো ;
কখনো বা সুরও বাজে।

সকালে সন্ধ্যায়

আমি দেখাই তোমায় বনের সবুজ

তুমি দেখাও আমায় আকাশের নীল,

দিন কেটে যায় এমনি ক'রে।

ছি ছি, চোখের জল ফেলে না

তোমার দিব্য,

যোগী হব না, সন্ন্যাসী হব না।

বোলপুর

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

পূর্ণিমা

তুমি পূর্ণিমা ?
ঘরের দাওয়া থেকে দেখি
স্খলিত স্বপ্নাঞ্চল
উঠোনের আধখানা ছুঁয়ে ।
কেন এলে ?
কেন এলে আবার এখানে ?

ক্রোশদুই দূরে
গিরিব্রজবেষ্টিত উপলবন্ধুর যেখানে উপত্যকা,
রক্ত আর কৃষ্ণবর্ণ ভূমি,
বনতুল্‌সি আর অনাম গুল্মৌষধির ঝোপ,
ইতস্তত দণ্ডায়মান নানা ভঙ্গীতে
শাল আর মহুলের বন,
তুমি তো এসেছ
শাপভ্রষ্ট যেন দেবকন্যা,
এসেছ,
মায়াময় ছায়ায় ছায়ায় তবু
ঈষৎ আত্মগোপন ক'রে !...
এখানে কেন এলে ?

এসেছ তুমি
বিশ্বেশ্বরের বালিয়াড়িময় সৈকতে
উদ্‌বেল অধীর লবণসমুদ্র যেখানে
ক্ষীরোদসমুদ্রে রূপান্তরিত
গদ্‌গদ ভাষায় দিগ্‌দিগন্তে ঘোষণা করছে তোমায়
বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী ব'লে ;
ফেনার ফুলে ফুলে
অর্ঘ্য রচিত হচ্ছে প্রতিক্ষণে।...
এখানে কেন এলে ?

অশ্বক্ষুরাকারে ব্যূহিত
অজন্তার শৈলমালাতটেও তুমি এসেছ
লগ্নভ্রষ্ট পূজারিনী ;
গুহায় গুহায় কান পেতে শুনছ
ত্রিশরণমন্ত্র জাগে কৈ—
সীমাহীন নির্জনতায় প্রান্তবহা গিরিনির্ঝরিণী
আপনারই অবিরল সঙ্গীতে সব
গেঁথে নিল কি ?...
এখানে কেন এলে ?

স্বপ্নময়ী পূর্ণিমা,
আবার আমায় কেন দেখা দিলে ?

চিত্রোৎপলা

আমি নই প্রেমিক,
আমি নই কবি ;
আমি নই কিশোর !
আমি সেই ধূলি
আজও যা ফুল হয়ে ওঠে নি।
অকালে
কেন তুমি এলে ?

ঝাঝা
২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

সূচীপত্র

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১	ডালপাল	ডালপালা
৩৭	১০	বেণুকুঙ্গে	বেণুকুঞ্জে